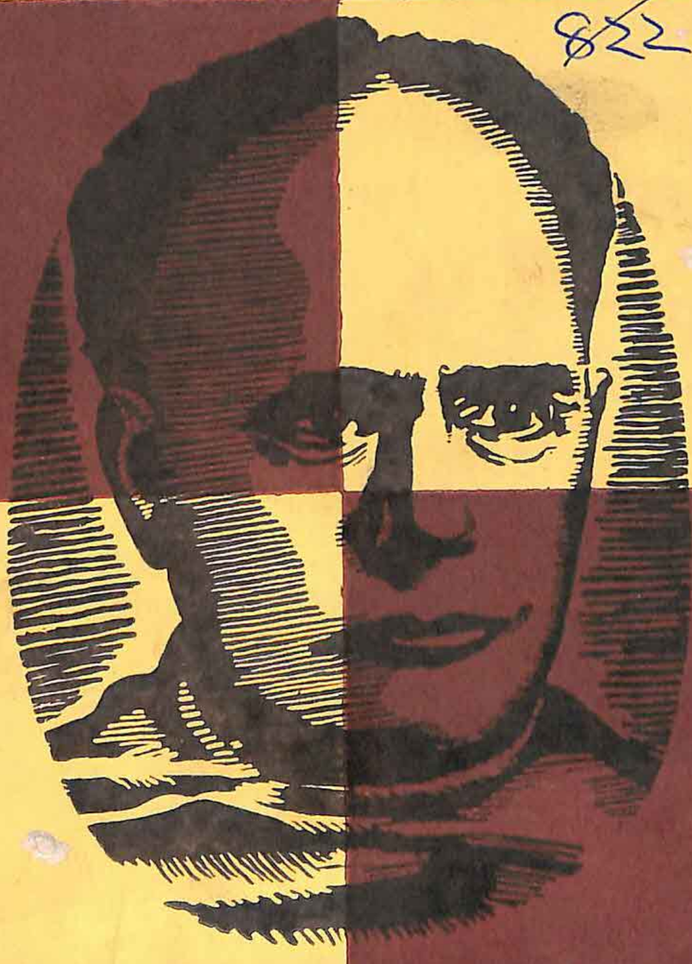
ইন্দ্র মিত্র

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা



বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা

ইন্দ্রমিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ অষ্টম মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৮৩
নবম মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৮ মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩০০

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১০·০০

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

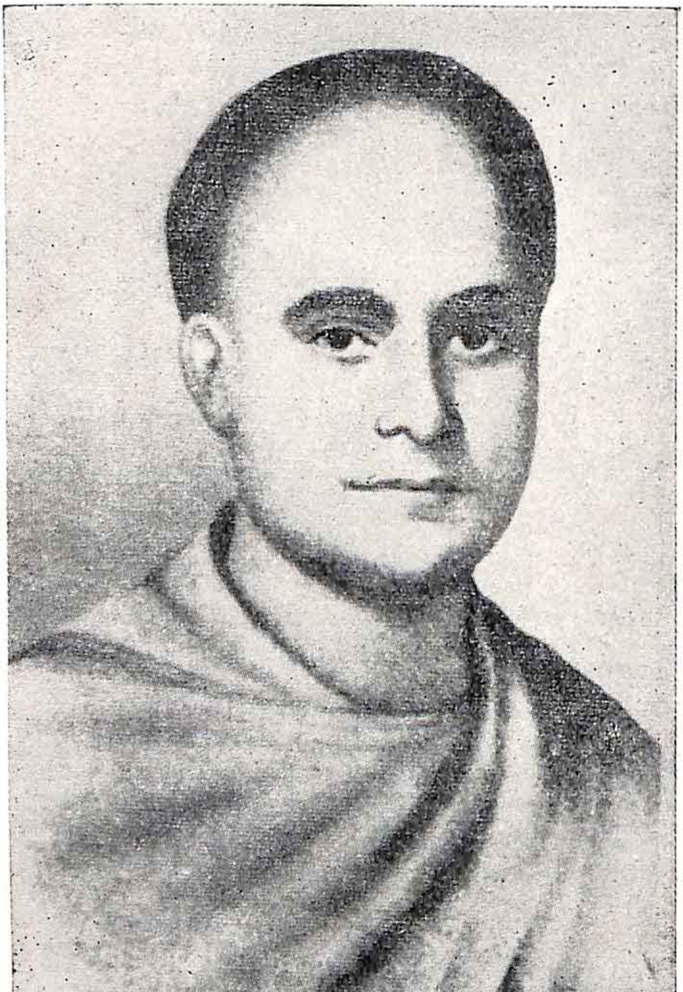
আমাদের প্রকাশনায় লেখকের অন্যান্য বই

শরৎ কথামালা
শুভদিন
মহারাজ

নিবেদন

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে উদ্ধার করা গেছে। সেজন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের কাছে আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি।

ইন্দ্রমিত্র



এক

বনমালিপুরে থাকতেন ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর পাঁচ ছেলে : নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন, রামচরণ। একান্নবর্তী পরিবার।

ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন নৃসিংহরাম আর গঙ্গাধর। সংসারে ভাঙন ধরল। অবস্থা ক্রমশ এমন হয়ে উঠল যে রামজয় সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। সংসার ছেড়ে রামজয় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, সংসারে রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী দুর্গাকে, তাঁর দুটি ছেলেকে, চারটি মেয়েকে।

কিন্তু দুর্গাও বেশিদিন থাকতে পারলেন না শ্বশুরের ভিটেয়। বাধ্য হয়ে তাঁকেও চলে আসতে হল বাপের বাড়িতে। বীরসিংহে। দুর্গা আর তাঁর ছয়টি ছেলেমেয়ে। দুটি ছেলে : ঠাকুরদাস আর কালিদাস। চারটি মেয়ে : মঙ্গলা ; কমলা ; গোবিন্দমণি ; অন্নপূর্ণা।

দুর্গা বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের মেয়ে। উমাপতি মস্ত পণ্ডিত। তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। সংসারে কর্তৃত্ব করেন উমাপতির ছেলে আর ছেলের বৌ। অর্থাৎ, দুর্গার ভাই আর ভাইয়ের বৌ।

কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গা বুঝতে পারলেন, ভাই আর ভাইয়ের বৌ খুশি হননি। কতকাল দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে-পরাতে হবে ঠিক কী—এই ভাবনাতেই দুর্গার ভাই আর ভাইয়ের বৌ বিরূপ হয়ে উঠেছেন। ভাইয়ের বৌ কথায়-কথায় এমন সব কথা বলেন যাতে দুর্গার মান থাকে না।

উমাপতি একটা ব্যবস্থা করে দিলেন তখন। নিজের বাড়ির কাছাকাছি একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই কুঁড়েঘরে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে লাগলেন দুর্গা। সুতো

কাটতেন দুর্গা। সামান্য কিছু আয় হত তাতে। উমাপতি মাঝে-মাঝে কিছু কিছু সাহায্য করতেন। তবু সংসার চলে না, চলবার কথা নয়।

ঠাকুরদাসের বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো বছর। ঠাকুরদাস সাব্যস্ত করলেন, কলকাতা যাবেন, টাকা রোজগার করবেন, মা-ভাই-বোনের দুঃখ ঘোচাবেন।

মায়ের অনুমতি নিয়ে ঠাকুরদাস চলে এলেন কলকাতায়। এলেন জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কারের কাছে। কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর কাছে সব কথা বললেন, সাহায্য চাইলেন, আশ্রয় চাইলেন।

জগন্মোহনের বাড়িতে আশ্রয় পেলেন ঠাকুরদাস।

আশ্রয় তো পেলেন, কিন্তু মা-ভাই-বোনের দুঃখ দূর করার উপায় কী? একমাত্র উপায় হচ্ছে ইংরেজী শেখা। মোটামুটি ইংরেজী শিখলেই সদাগরী আপিসে কাজ পাওয়া যাবে। মা-ভাই-বোনের দুঃখ তাহলে নিশ্চয়ই দূর করা যাবে। হ্যাঁ, ইংরেজীই একমাত্র উপায়।

কিন্তু ইংরেজী শেখাবে কে? সে-ব্যবস্থাও জগন্মোহন করে দিলেন। জগন্মোহনের একজন বন্ধু ইংরেজী জানেন। তিনি ঠাকুরদাসকে ইংরেজী শেখাতে রাজী হলেন।

সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরদাস ইংরেজী শিখতে যেতেন। ফিরতে রাত হয়ে যেত।

দিনের পর দিন যায়।

একদিন সেই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞেস করলেন—দিনে-দিনে তুমি এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?

ঠাকুরদাস চুপ করে রইলেন। তাঁর দু' চোখ জলে ভরে উঠল। ভদ্রলোক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

যে বাড়িতে ঠাকুরদাস আশ্রিত, সন্ধ্যার পরেই সেখানে উপরি লোকের খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। ঠাকুরদাস তখন ইংরেজী শিখতে আসেন। তাই রাত্রে আর খাওয়া জোটে না।

যাঁর কাছে ইংরেজী শিখতেন ঠাকুরদাস, তাঁর একজন আত্মীয়

তখন ওখানে উপস্থিত। বৃত্তান্ত শুনে তিনি ঠাকুরদাসকে বললেন—যা শুনলাম, তোমার আর ও-বাড়িতে থাকা হবে না। তুমি যদি রেঁধে খেতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে আমার বাসায় রাখতে পারি।

তাই হল।

কিন্তু এই আশ্রয়দাতার মনপ্রাণ যেমন ভালো, আয়-আদায় তেমন ভালো নয়। দালালি করতেন ভদ্রলোক। এই সময়েই আবার ভদ্রলোকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। দিন চলে না। বাইরে-বাইরে ঘোরেন ভদ্রলোক, কিছু রোজগার হলে দুপুরবেলা বাসায় আসেন। দু'জনেরই কোনোদিন অর্ধাহার, কোনোদিন অনাহার। কোনো-কোনো দিন ভদ্রলোক দিনের বেলা বাসায় আসেন না। সে-সময়ে ঠাকুরদাসকে সমস্ত দিন উপোস করে থাকতে হয়।

ঠাকুরদাসের সম্বলের মধ্যে আছে একখানা পিতলের থালা, একটা ছোটো ঘটি। থালাখানা বিক্রী করে দিলে ক্ষতি কী? না, ক্ষতি নেই, বরং থালা বিক্রীর পয়সায় খাবার কেনা যাবে। আর থালার কাজ চালানো যাবে শালপাতায়।

থালাখানা নিয়ে নতুন বাজারে কাঁসারিদের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ঠাকুরদাস। কিন্তু সকলেই একবাক্যে ঠাকুরদাসকে ফিরিয়ে দিল। বলল—অচেনা-অজানা লোকের কাছে পুরনো বাসন কিনতে পারব না। পুরনো বাসন কিনে কখনো-কখনো বড়ো ফ্যাসাদে পড়তে হয়। আমরা তোমার থালা নেব না।

একদিন দুপুর রোদে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠাকুরদাস। বড়বাজার থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত হেঁটে এলেন। সেদিন পেটে এককণা খাবার নেই, শরীর আর বইতে চায় না। ভেবেছিলেন, হাঁটাহাঁটি করলে ক্ষিদের কষ্ট থাকবে না, কিন্তু উল্টো ফল হল, হাঁটাহাঁটিতে আরো কাহিল হয়ে পড়লেন। একটি মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোকের মুড়ি-মুড়কির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করলেন—বাবাঠাকুর, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ঠাকুরদাস বললেন—একটু জল খেতে চাই।

সাদরে ও সস্নেহে ঠাকুরদাসকে বসতে বললেন স্ত্রীলোকটি। বামুনের ছেলেকে শুধু জল দিলে পাপ হবে। স্ত্রীলোকটি মুড়কি দিলেন, জল দিলেন।

নিদারুণ ক্ষুধায় ব্যগ্রভাবে মুড়কি খেলেন ঠাকুরদাস। সে-দৃশ্য স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টিতে দেখলেন। বললেন—আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয়নি বাবাঠাকুর ?

—না, মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাইনি।

স্ত্রীলোকটি তখন জল খেতে বারণ করলেন ঠাকুরদাসকে। খানিক অপেক্ষা করতে বললেন। কাছাকাছি গয়লার দোকান থেকে দই নিয়ে এলেন। মুড়কির সঙ্গে দই দিয়ে পেট ভরে ফলার খেতে দিলেন ঠাকুরদাসকে।

ঠাকুরদাসের মুখে তাঁর ইতিবৃত্ত শুনলেন স্ত্রীলোকটি। জিদ করে বললেন—যেদিনই দরকার হবে, এখানে এসে ফলার করে যেও।

ঠাকুরদাস যেতেন ওখানে। দিনের বেলা যখন কিছু খাবার জুটত না, ওখানে গিয়ে পেট ভরে ফলার করে আসতেন।

নিজের দিনগুলি তো যা-হোক কেটে যাচ্ছে, কিন্তু মা-ভাই-বোন? তাদের ক্লিষ্ট মুখ অহরহ চোখের উপর ভাসতে থাকে। ঠাকুরদাস একদিন আশ্রয়দাতা ভদ্রলোকের কাছে কেঁদে পড়লেন—কোথাও আমাকে একটু কাজ-কর্ম যোগাড় করে দিন। 'আমি আর পারি না। মা-ভাই-বোনের কথা মনে পড়লে আমার আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না।

এই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। মাইনে দু'টাকা। খুশি হলেন ঠাকুরদাস। তা বলে নিজের খরচ এক কপর্দকও বাড়তে দিলেন না। মাইনের দু'টাকাই বাড়িতে পাঠান মা-ভাই-বোনের জন্য। এদিকে তাঁর কাজকর্ম দেখে মনিবও খুব খুশি। দু-তিন বছর পরে ঠাকুরদাসের মাইনে পাঁচ টাকা হয়ে গেল।

ওদিকে একটা মস্ত ঘটনা ঘটল এই সময়ে। সাত-আট বছর পরে ঠাকুরদাসের বাবা রামজয় সংসারে ফিরে এলেন। সংসার

ছেড়ে নানা তীর্থে ঘুরেছেন এতকাল। দ্বারকায়, জ্বালামুখীতে, বদরিকাশ্রমে।

বিদ্যাসাগরের সেজো ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "রামজয় এক দিবস (কেদার পাহাড়ে) নিশীথ সময়ে স্বপ্নে দেখেন যে, রামজয়! তুমি বৃথা কেন ভ্রমণ করিতেছ? স্বদেশে যাও, তোমার বংশে এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমার বংশের তিলক হইবেন। তিনি সাক্ষাৎ দয়ার সাগর ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া নিরন্তর বিদ্যা দান ও নিরুপায় লোকদিগের ভরণপোষণাদির ব্যয়নির্ব্বাহ দ্বারা তোমার বংশের অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন। রামজয় পাহাড়ের মধ্যে নিশীথ সময়ে এরূপ অসম্ভব স্বপ্ন-দর্শন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বহুদিন অতীত হইল সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া নিভৃত স্থানে ঈশ্বরারাধনায় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। এক্ষণে তাহারা কি করিতেছে ও কে আছে না আছে তাহাও জানি না। এবম্বিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত হইলে কে যেন বলিয়া দিল, তুমি পরিবারগণের নিকট প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না; তোমার প্রতি ঈশ্বর সদয় হইয়াছেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া রামজয় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন…।"

সংসারে ফিরে এসেছেন রামজয়। দেশে এসে প্রথমেই গিয়েছিলেন বনমালিপুরে। সেখানে গিয়ে দেখেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই নেই। চলে এসেছেন তারপর বীরসিংহে। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "শ্বশুরালয়ে বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি (রামজয়) অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য, কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের পরিচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহগ্রামে, আমাদের বাস হইয়াছিল।"

রামজয় সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা বলে রাখা ভালো।

রামজয় তর্কভূষণের যেমন অপার সাহস, তেমনি অগাধ শক্তি।

একখানা লোহার ডাণ্ডা ছিল তাঁর। সেখানা হাতে না নিয়ে তিনি কখনো বাড়ি থেকে বেরোতেন না।

সে-সময়ে পথে ডাকাতের ভয় ছিল খুব। অনেক জায়গায় লোকজন বড়ো রকম দল না বেঁধে যেতে সাহস পেত না। কিন্তু রামজয় তর্কভূষণের প্রাণে ভয়ডর নেই। লোহার ডাণ্ডাখানা হাতে নিয়ে তিনি নির্ভয়ে ওসব জায়গায় একা যাতায়াত করতেন। ডাকাতেরা দু-চারবার তাঁকে আক্রমণ করেছে, এবং উপযুক্ত আক্কেলসেলামি পেয়েছে। পরে ডাকাতেরা আর তাঁকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি।

ডাকাত দূরের কথা, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকেও রামজয় পরোয়া করতেন না তেমন।

একুশ বছর বয়সে রামজয় একবার একা মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। ওদিকে তখন বিস্তর বন-জঙ্গল। এবং বন-জঙ্গলে যাদের থাকবার কথা তারাও আছে। অর্থাৎ, বাঘ ভালুক ইত্যাদি।

রামজয় এক জায়গায় খাল পার হয়ে পাড়ে উঠেছেন, এমন সময় একটা ভালুক এসে পড়ল। নখের আঁচড়ে রামজয়ের সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। রামজয়ও ছাড়লেন না, সমানে তাঁর লোহার ডাণ্ডাখানা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভালুকটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। রামজয় তারপর লাথির পর লাথিতে ভালুকটাকে মেরে ফেললেন।

রামজয়ের সমস্ত শরীর থেকে তখন অনবরত রক্ত পড়ছে। ওই অবস্থায় প্রায় চার ক্রোশ হেঁটে রামজয় মেদিনীপুরে এসে পৌছলেন। উঠলেন এক আত্মীয়ের বাসায়। দু-মাস সেখানে শয্যাশায়ী থাকতে হল। তারপর বাড়ি ফিরে এলেন।

কিন্তু ওই ক্ষতচিহ্ন ইহজীবনে তাঁর শরীর থেকে মিলিয়ে যায়নি।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"(রামজয়) তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী

মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, বটে; কিন্তু, তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্য্যপরম্পরায়, তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত, ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।”

একবার চমৎকার একটা মজার কথা বলেছিলেন রামজয় তর্কভূষণ। বলেছিলেন বীরসিংহে।

যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে-সময়ের বীরসিংহ গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন ‘নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর’। নিজেদের লাভের জন্য তাঁরা না করতে পারতেন এমন কাজ নেই। তাছাড়া সময়ে-সময়ে দারুণ নির্বোধের মতো কাজ করে ফেলতেন তাঁরা। রামজয় তর্কভূষণ ঘোরতর অপছন্দ করতেন তাঁদের। স্পষ্ট ভাষায় বলতেন—এ-গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সকলই গোরু।

লোকেরা একটা জায়গা নোংরা করে রেখেছে, আর রামজয় সেই জায়গা দিয়েই চলে যাচ্ছেন। গ্রামের একজন কর্তাব্যক্তি

বললেন—তর্কভূষণ মশায়, ওখান দিয়ে যাবেন না।

তর্কভূষণ জিজ্ঞেস করলেন—দোষ কী?

—ওখানে বিষ্ঠা আছে।

খানিকক্ষণ অপলকে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন রামজয় তর্কভূষণ। তারপর বললেন—এখানে বিষ্ঠা কোথায়? আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যে-গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সেখানে বিষ্ঠা কোত্থেকে আসবে?

রামজয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালীর মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না।···এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক।

কয়েকদিন বীরসিংহে কাটিয়ে রামজয় গেলেন কলকাতায়। বড়ো ছেলে ঠাকুরদাস কলকাতায় থাকে। কাজ করে।

বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের বেশ ভালো অবস্থা। রামজয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর। রামজয়ের সমস্ত ইতিহাস শুনলেন তিনি। রামজয়কে বললেন—ঠাকুরদাসকে আমার কাছে রেখে যান।

তাই হল। ঠাকুরদাস উঠে এলেন ভাগবতচরণের বাড়িতে। ভাগবতচরণই ঠাকুরদাসকে আরেকটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। আট টাকা মাইনে। আর দু'বেলা খেতে পাওয়া যায় ভাগবতচরণের বাড়িতে।

ঠাকুরদাসের বয়স তেইশ কি চব্বিশ বছর। বিয়ে হল তখন। বিয়ে হল ভগবতীর সঙ্গে। ভগবতীর বাড়ি গোঘাটে, বাবার নাম রামকান্ত তর্কবাগীশ। ভগবতীর মামাবাড়ি পাতুলে, মাতামহের নাম পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"পাতুলনিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটীতেই চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি, স্বগ্রামে ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে, সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্যা হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, গোঘাটে একটি সুপাত্র আছে, এই সংবাদ পাইয়া, ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন ; অবাধে অধ্যয়ন করিয়া, একুশ বাইশ বৎসরে, ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, এবং তর্কবাগীশ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, এই পাত্রের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিতচিত্তে, কন্যাদানে সম্মত হইলেন, এবং বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, পুত্রদের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামকান্ত তর্কবাগীশের সহিত, জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার বিবাহ দিলেন।

কালক্রমে, গঙ্গাদেবীর গর্ভে, তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা জন্মিল ; জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী, কনিষ্ঠা ভগবতী। কিছু দিন পরে, তর্ক-বাগীশ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে, তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর, অধ্যাপনা-কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ যত্ন রহিল না। তাঁহার অযত্ন দেখিয়া, ছাত্রেরা, ক্রমে ক্রমে, তদীয় চতুষ্পাঠী হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া, অব্যাঘাতে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে পারিব, এই ভাবিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই, শবসাধনের সমুচিত ফললাভ করিলেন। শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে, তিনি, তুড়ি দিয়া, "মঞ্জুর" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ফলকথা এই, সেই অবধি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে, উন্মাদগ্রস্থ হইলেন। অতঃপর, কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি তুড়ি দিয়া ও মঞ্জুর বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সময়ে সময়ে, ইহাও অবলোকিত হইত, যখন তিনি একাকী উপবিষ্ট আছেন, কেবল তুড়ি দিতেছেন, ও মঞ্জুর মঞ্জুর বলিতেছেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর বা অন্য কোনও অভিভাবক ছিলেন না। গঙ্গাদেবী, দুই শিশু কন্যা ও উন্মাদগ্রস্ত স্বামী লইয়া, বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং নিরুপায় ভাবিয়া, স্বীয় পিতা পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের নিকট, এই বিপদের সংবাদ পাঠাইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীকে আপন বাটীতে আনিলেন। এক স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপ উন্মাদগ্রস্ত জামাতার বাসার্থে নিয়োজিত হইল; তিনি তথায় অবস্থিতি করিলেন; কন্যা ও দুই দৌহিত্রী পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা করাইলেন; কিছুতেই কোনও উপকার দর্শিল না। অল্পদিনের মধ্যেই অবধারিত হইল, জামাতা, এজন্মে আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না। অত:পর, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীর ভরণপোষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই বর্ত্তিল। তিনিও যথোচিত যত্ন ও স্নেহ সহকারে, তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবিদ্যমান হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সংসারের কর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ ও চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় বিষয়কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। চারি সহোদরে, যাবজ্জীবন,

একান্নবর্ত্তী ছিলেন; যিনি যে উপার্জ্জন করিতেন, জ্যেষ্ঠের হস্তে দিতেন। জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। স্বীয় পরিবারের উপর, তাঁহার যেরূপ স্নেহ ও যেরূপ যত্ন ছিল, ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, তিনি বরং তাহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ ও অধিক যত্ন করিতেন। ফলকথা এই, তাঁহার কর্ত্তৃত্বকালে, কেহ কখনও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই।...

সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারিজনেই সমান ছিলেন; এজন্য, কেহ কখনও ইঁহাদের চারি সহোদরের মধ্যে, মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা, পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে, কালযাপন করিতেন, কন্যারা পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঐ অঞ্চলের কোনও পরিবার, এ বিষয়ে, এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায়, রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া, সকলেই পরম সমাদরে অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায়, এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে পার্শ্ববর্ত্তী বহুহর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদ্‌মোচন, অসময়ে

সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু, সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, একদিন একক্ষণের জন্যেও, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট, আমরা অশেষ প্রকারে, যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না! আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্র-কন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে, পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু একদিনের জন্যেও, স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ, ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর, এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার।”

বাঙলা হিসেবে: ১২-আশ্বিন, ১২২৭ সন; ইংরেজী হিসেবে: ২৬-সেপ্টেম্বর, ১৮২০ সাল। মঙ্গলবার। সেদিন দুপুরবেলা হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাসের প্রথম সন্তানের জন্ম হল। হ্যাঁ, বীরসিংহ গ্রাম সে-সময়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল।

বিদ্যাসাগরের সেজোভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “ঈশ্বরচন্দ্র যৎকালে গর্ভে ছিলেন, তৎকালে জননী ভগবতী দেবী দশমাস উন্মত্তার ন্যায় ছিলেন, পিতামহী দুর্গাদেবী বধূর রোগোপশমের জন্য কতই প্রতিকার করিয়াছিলেন, কিছুতেই উপশম হয় নাই; তৎকালে কোন কোন বৃদ্ধলোক পিতামহী ও মাতামহীকে বলিতেন ভূতে পাইয়াছে। কোন কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিতেন ডাইনি পাইয়াছে। এই সকলের রোজা আনাইয়া দেখান হয়, কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে উদয়গঞ্জনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য

মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি এ প্রদেশের মধ্যে চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, রোগের তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা ছিল, বিশেষতঃ ইনি রোগনির্ণয়ের পূর্ব্বে রোগীর কোষ্ঠী গণনা করিতেন। পিতামহীকে বলেন, তোমার বধূমাতার আমি রোগনির্ণয় করিলাম, এক্ষণে ইহার কোষ্ঠী দেখিতে ইচ্ছা করি। চিকিৎসক ভট্টাচার্য্য মহাশয়, উক্তরূপ কথা বলিলে দুর্গাদেবী তাঁহার কোষ্ঠী দেখিতে দিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ভবানন্দ গণনা করিয়া বলিলেন, ইঁহার কোন রোগ নাই, ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার তেজঃপ্রভাবে এরূপ হইতেছে, কোনরূপ ঔষধ সেবন করাইবেন না। গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইলেই ইনি রোগমুক্তা হইবেন। ভবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। প্রসবের পরক্ষণেই তাঁহার আর কোন উন্মাদচিহ্ন লক্ষিত হয় নাই।”

ঠাকুরদাসের প্রথম সন্তানের যখন জন্ম হল, ঠাকুরদাস তখন কোথায় ?

ঠাকুরদাস আহারান্তে কোমরগঞ্জে গেছেন, মঙ্গলবারের হাটে। সুখবরটা তাঁকে অবিলম্বে দিতে হয়। রামজয় অবিলম্বে কোমরগঞ্জের দিকে হাঁটাপথ ধরলেন। পথেই ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রামজয় সুখবরটা এক কথায় ভাঙলেন না। বললেন—একটা এড়ে বাছুর হয়েছে।

বাড়িতে একটা গোরুর তখন বাছুর হবার কথা। ঠাকুরদাস ভাবলেন, সেই গোরুর বুঝি একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।

বাড়ি ফিরেই ঠাকুরদাস এগোলেন গোয়ালঘরের দিকে। রামজয় হাসতে হাসতে বললেন—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এদিকে এস। এঁড়ে বাছুর দেখাচ্ছি।

গোয়ালঘরে নয়, ঠাকুরদাসকে নিয়ে আরেক ঘরে ঢুকলেন রামজয়। নবজাতককে দেখালেন। বললেন—একে এঁড়ে বাছুর বললাম কেন জানো ? এ এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে হবে। যা ধরবে তাই করবে, কাউকে ভয় করবে না।

তারপর বললেন—ও হবে ক্ষণজন্মা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথিতযশা, দয়ার অবতার। ওর জন্য আমার বংশ ধন্য হবে। ওর নাম রাখলাম ঈশ্বরচন্দ্র।

লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন: "তাহার (ঈশ্বরচন্দ্র) জন্ম দিনে বাদ্যোদ্যম হয় নাই। নৃত্যগীতও কেহ দেখে নাই। তবে সূতিকা ষষ্ঠী পূজার দিন অনেক বালকবালিকা খৈ মুড়কী মোয়া পাইয়া আনন্দে গদ্‌গদ চিত্তে নৃত্যগীত ও শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল। জন্ম সময়ে দুই চারিজন সধবা পুরস্ত্রী মাঙ্গলিক উলুউলু ধ্বনি করিয়াছিলেন…। ঐ উলুধ্বনি চতুর্দ্দশ ভুবনে তৎকালে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।"

এখানে বলে রাখা ভালো, ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর সাত ছেলে ও তিন মেয়ে। সাত ছেলের নাম: ঈশ্বরচন্দ্র; দীনবন্ধু; শম্ভুচন্দ্র; হরচন্দ্র; হরিশ্চন্দ্র; ঈশানচন্দ্র; সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি খুব অল্পবয়সে মারা গেছে, তাকে বাড়ির সকলে 'ভূতো' বলে ডাকত। তিন মেয়ের নাম: মনোমোহিনী; দিগম্বরী; মন্দাকিনী।

দুই

পাঁচ বছর বয়স হল ঈশ্বরের।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "তৎকালে বীরসিংহগ্রামে সনাতন বিশ্বাস পাঠশালার সরকার ছিলেন। সনাতন ছোট ছোট বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় বিলক্ষণ প্রহার করিতেন, তজ্জন্য শিশুগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া পাঠশালায় যাইতে ইচ্ছা করিত না, এ কারণ পিতৃদেব বীরসিংহনিবাসী কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষক মনোনীত করিলেন। কালীকান্ত ভঙ্গকুলীন ছিলেন, সুতরাং বহুবিবাহ করিতে আলস্য করেন নাই, তিনি ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরুটিগ্রামেই প্রায় অবস্থিতি করিতেন, অপরাপর শ্বশুরভবনেও টাকা আদায় করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। পিতৃদেব ভদ্রেশ্বর ও শ্রীরামপুর যাইয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে, কালীকান্ত সর্ব্বদা গোরুটিতে থাকেন। তথায় যাইয়া তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া সমভিব্যাহারে করিয়া বীরসিংহায় আনিলেন এবং কয়েক দিন পরে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। কালীকান্ত অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন। শিশুগণকে শিক্ষা দিবার বিশেষরূপ প্রণালী জানিতেন এবং শিশুগণকে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ করিতেন এ কারণ ছোট ছোট বালকগণ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিত। এতদ্ভিন্ন তিনি সকলের সহিত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন, স্থানীয় লোক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। এবং সকলেই তাঁহাকে গুরুমহাশয় বলিত।"

ঈশ্বরকে ভর্তি করে দেওয়া হল কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়। "চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইঁহার

পাঠশালায় ছাত্রেরা, অল্প সময়ে, উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিত; এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন।"

পড়াশোনার দিকে ঈশ্বরের খুব টান আছে, কিন্তু এদিকে দুরন্তপনায়ও সে অদ্বিতীয়। লোকে ঈশ্বরের জ্বালায় অস্থির। পাড়ার লোকের বাগানের যত রকম ফল চুপে চুপে খেয়ে আসে। কেউ রোদে কাপড় শুকোতে দিয়েছে, ঈশ্বর তাতে ছোটো একখানা লাঠি দিয়ে বিষ্ঠা লাগিয়ে রেখে গেছে। ধানক্ষেতের কাছ দিয়ে যেতে-যেতে, কোন্ খেয়ালে কে জানে, খানিক কাঁচাধানের শিষ নিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে, খানিক ফেলে দিচ্ছে মাটিতে। একবার তো যবের শিষ খেতে গিয়ে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। গলায় যবের কাঁটা ফুটে গেল। ঠাকুমা অনেক কষ্টে গলায় আঙুল দিয়ে সেই কাঁটা বের করে দিলেন।

কালীকান্তের পাঠশালায় যাবার পথে ঈশ্বর প্রায় প্রত্যেকদিন পাড়ার মথুরামোহন মণ্ডলের মা আর বৌকে বিরক্ত করার জন্য মথুরামোহনের বাড়ির দরজায় মলমূত্র ত্যাগ করে রাখে। মথুরামোহনের মায়ের নাম পার্বতী, বৌয়ের নাম সুভদ্রা। পার্বতী আর সুভদ্রা নিজেদের হাতে সেই ময়লা পরিষ্কার করতেন।

কোনোদিন হয়তো সুভদ্রা বিরক্ত হয়ে বলতেন—দুষ্ট বামুন, রোজই তুমি পাঠশালায় যাবার সময় আমার দরজায় পায়খানা করে যাবে? আর যদি এমন করো তো তোমার গুরুমহাশয়কে বলে দেব, তোমার ঠাকুমাকে বলে দেব, তোমাকে শাসন করাব।

শুনে সুভদ্রার শাশুড়ী বৌকে বলতেন—এই ছেলেটি সহজ নয়। ওর ঠাকুর্দা বারো বছর বিবাগী হয়ে তীর্থক্ষেত্রে জপতপ করে দিনপাত করতেন, তিনি সাক্ষাৎ ঋষিতুল্য, তাঁর মুখে শুনেছি, এই বালক অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন হবে। অতএব তুমি বিরক্ত হয়ো না। আমি নিজে এর মলমূত্র পরিষ্কার করব। এই বালক যে কে তা ভবিষ্যতে জানতে পারবে।

ঈশ্বর দারুণ দুরন্ত। তা বলে লেখাপড়ার দিকে কোনো ত্রুটি নেই। হাতের লেখাটি ভারি সুন্দর। আশ্চর্য স্মরণশক্তি।

আট বছর বয়স পর্যন্ত ঈশ্বর পড়ল কালীকান্তের পাঠশালায়।

কালীকান্ত একদিন ঠাকুরদাসকে বললেন—এখানকার পাঠশালার পড়া শেষ হয়েছে ঈশ্বরের। ওকে এখন কলকাতায় নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে ইংরেজী শেখালে ভালো হয়।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "অগ্রজকে (ঈশ্বরচন্দ্র) কলিকাতা লইয়া যাইবার নাম শুনিয়া, জননীদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে এ প্রদেশের কাহারও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতা যাইবার রীতি ছিল না। ব্রাহ্মণতনয়গণ কেহ কেহ বাল্যকালে টোলে পড়িত। অধিক বয়স হইলে বিদেশের টোলে অধ্যয়নার্থে যাত্রা করিত, কেহ কেহ জমিদারী সেরেস্তায় কাগজ লিখিতে শিখিতেন।"

রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যুর পর পিতৃকৃত্য সেরে কলকাতায় যাবার সময় ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে সঙ্গে নিলেন। আনন্দরাম গুটিও রইল সঙ্গে। পথ চলতে চলতে ঈশ্বর যখন ক্লান্ত হবে, তখন এই আনন্দরাম ওকে কোলে বা কাঁধে নিয়ে পথ চলবে। কালীকান্তও সঙ্গে চললেন।

বীরসিংহ থেকে কলকাতা। পথ খুব কম নয়। সিয়াখালার কাছে সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠে ঈশ্বর লক্ষ্য করল—পাথর। বাটনা-বাটা শিলের মতো একেকখানা পাথর। পথের পাশে মাঝে-মাঝে এই পাথর কেন?

ঈশ্বর জিজ্ঞেস করল—ওই শিলগুলো কী, বাবা?

ঠাকুরদাস হাসলেন। বললেন—ওগুলো শিল নয়। ওগুলোকে বলে মাইলস্টোন।

—মাইলস্টোন কী, বাবা?

—মাইলস্টোন হল একটা ইংরেজী কথা। এক মাইল আমাদের আধক্রোশের সমান, আর স্টোন মানে পাথর। কলকাতা থেকে প্রত্যেক এক মাইল অন্তর ওরকম একেকখানা পাথর বসানো

আছে। প্রত্যেক পাথরে লেখা আছে—কলকাতা থেকে ওখান পর্যন্ত কত মাইল পথ। কলকাতা থেকে এক মাইল দূরে যে-পাথরখানা বসানো আছে, তাতে ইংরেজীতে এক লেখা আছে। আর দ্যাখো, এখানায় লেখা আছে উনিশ। মানে কলকাতা এখান থেকে উনিশ মাইল। সাড়ে ন'ক্রোশ।

বাঙলা অঙ্কের হিসেব ঈশ্বরের জানা আছে। উনিশ লেখা পাথরখানা ভালো করে দেখল ঈশ্বর। একের পিঠে নয় উনিশ। পাথরে হাত দিয়ে ঈশ্বর বাবাকে জিজ্ঞেস করল—ইংরেজীতে কি এটা এক আর এটা নয়?

ঠাকুরদাস বললেন—হ্যাঁ।

ঈশ্বর মনে-মনে সাব্যস্ত করল, পথে যেতে-যেতে ইংরেজী অঙ্ক শিখে ফেলতে হবে।

কলকাতা দূর আছে। কতদূর? দশ মাইল। পাঁচ ক্রোশ।

ঈশ্বর বলল—বাবা, আমি ইংরেজী অঙ্ক চিনে নিয়েছি। আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত শিখে ফেলেছি।

সত্যি-সত্যি শিখে ফেলেছে? আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখা যাক।

কলকাতা আর ন'মাইল দূরে। ন'নম্বর লেখা পাথরখানা দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—কত?

ঈশ্বর বলল—নয়।

কলকাতা আর আট মাইল দূরে। আট নম্বর লেখা পাথরখানা দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—এই?

ঈশ্বর বলল—আট।

কলকাতা আর সাত মাইল দূরে। সাত নম্বর লেখা পাথরখানা দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—এটা?

ঈশ্বর বলল—সাত।

ঠিক আছে—ঠিক আছে।

ঠিক আছে? ঠাকুরদাসের মনে খট করে একটু সন্দেহ হল। দশের আগে নয়, নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত। হয়তো আসলে ইংরেজী অঙ্ক চেনে না, হয়তো চালাকি দিয়ে মেরে দিচ্ছে।

চালাকি? আচ্ছা, দেখা যাক।

ছ'নম্বর লেখা পাথরখানা ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে দেখালেন না। গোপন করে গেলেন। পাঁচ নম্বর লেখা পাথরখানার সামনে এসে বললেন—এবার বলো। এটা কত?

ঈশ্বর বলল—বাবা, এটা ছয় হওয়া উচিত কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখে রেখেছে।

ঠাকুরদাস খুশি হলেন। বললেন—সত্যি-সত্যি তুমি ইংরেজী অঙ্ক চিনেছ। ওটা ঠিক আছে। ছ'-নম্বর লেখা পাথরখানা আমি তোমাকে দেখাইনি।

কালীকান্তও খুশি হলেন। ঈশ্বরের চিবুক ধরে আশীর্বাদ করলেন তিনি। বললেন—বেশ বাবা, বেশ।

তারপর ঠাকুরদাসকে বললেন—ঈশ্বরের পড়াশোনার ভালো ব্যবস্থা করবেন। বেঁচে থাকলে ও মানুষের মতো মানুষ হবে।

ভাগবতচরণ সিংহের একমাত্র ছেলের নাম জগদ্দুর্লভ। ভাগবতচরণ গত হলেন, তারপর থেকে জগদ্দুর্লভই সংসারের কর্তা। তাঁর বাড়িতেই থাকেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বর বাবার সঙ্গে এই বাড়িতেই উঠল।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "পরদিন প্রাতে পিতৃদেব জগদ্দুর্লভবাবুর এক ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছেন, তথায় অগ্রজ (ঈশ্বরচন্দ্র) বসিয়া বলিলেন, বাবা আমি ইহা ঠিক দিতে পারি। উক্ত সিংহ বলিলেন, ঈশ্বর! তুমি ইংরাজী অঙ্ক কেমন করিয়া জানিলে? তাহাতে দাদা (ঈশ্বরচন্দ্র) বলিলেন, কেন, বাবা ও কালীকান্ত খুড়া শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্য্যন্ত পাথরে অঙ্কিত মাইল-ষ্টোন দেখাইয়াছেন। তাহাতেই ইংরাজী অঙ্কের ১ সংখ্যা হইতে ১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত শিখিয়াছি। সেই জন্য ঠিক দিতে পারিব সাহস করিয়াছি। উক্ত সিংহ কয়েকটা বিল ঠিক দিবার জন্য দাদাকে (ঈশ্বরচন্দ্র) দিলেন, ঐ বিলে দাদার (ঈশ্বরচন্দ্র) ঠিক দেওয়া নির্ভুল হইল দেখিয়া,

কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, তুমি চিরজীবী হও, আমি যে তোমার প্রতি আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা অদ্য আমার সার্থক হইল।”

ঠাকুরদাস সে-সময়ে রামসুন্দর মল্লিকের দোকানে কাজ করেন, দশটাকা মাইনে। বড়বাজারের চকে রামসুন্দরের লোহা-পিতলের নানারকম জিনিসের দোকান। যারা ধারে মাল কিনতেন, তাদের কাছ থেকে ঠাকুরদাসকে টাকা আদায় করে আনতে হত।

জগদ্দুর্লভের বাড়িতে থেকে ঈশ্বরের একদিনও মনে হয়নি যে সে পরের বাড়িতে আছে। এ-বাড়ির সকলেই ঈশ্বরকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু জগদ্দুর্লভের ছোটো বোন রাইমণির স্নেহ-ভালোবাসার কোনো তুলনা নেই।

কোথায় কলকাতা, কোথায় বীরসিংহ। ঠাকুমার কথা ভেবে কখনো-কখনো খুব কষ্ট হয়, ঈশ্বরের দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। কিন্তু রাইমণির স্নেহ-যত্নে ঈশ্বরের সেই কষ্ট অনেকখানি দূর হয়ে গেল। রাইমণির একটিমাত্র ছেলে, নাম গোপাল। সে ঈশ্বরের প্রায় সমবয়সী। রাইমণির কাছে গোপালও যেমন, ঈশ্বরও তেমনি।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন: “স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃাত প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।”

জগদ্দুর্লভের বাড়ির কাছেই শিবচরণ মল্লিকের বাড়ি। সেখানে

একটা পাঠশালা বসে। পাঠশালার গুরুমশায়ের নাম স্বরূপচন্দ্র দাস। ঈশ্বরকে ভর্তি করা হল ওই পাঠশালায়। অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ—এই তিনমাস ওই পাঠশালায় পড়ল ঈশ্বর।

ফাল্গুনের গোড়ার দিকে পড়ল অসুখে। কবরেজি চিকিৎসা হল, কিন্তু অসুখ সারে না। খবর পেয়ে ঈশ্বরের ঠাকুমা বীরসিংহ থেকে কলকাতায় চলে এলেন। দু'তিনদিন কলকাতা থেকে তিনি ঈশ্বরকে নিয়ে বীরসিংহে চলে গেলেন। কোনো ওষুধ-বিষুধ লাগল না, সেখানে সাত-আট দিনেই ঈশ্বর সুস্থ হয়ে উঠল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভে আবার কলকাতায় নিয়ে আসা হল ঈশ্বরকে।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না পারিলে, ঐ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসিত। এবার আসিবার পূর্ব্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, চলিয়া যাইতে পারিবে, না লোক লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না। পিতৃদেব আমায় লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিলাম। সেদিন পাতুলে অবস্থিতি করিলাম।

তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগর নামক গ্রাম আমার কনিষ্ঠা পিতৃম্বসা অন্নপূর্ণাদেবীর শ্বশুরালয়। ইতিপূর্ব্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন ; এজন্য, পিতৃদেব, কলিকাতায় আসিবার সময়, তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। রামনগর পাতুল হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রথম দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট

উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আর আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রইল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভপ্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ফলতঃ, আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং, তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা, খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড় প্রহর লাগিল।

সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।"

এবার আবার লেখাপড়ার কথা। গুরুমশায়ের পাঠশালার পালা তো শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন কোথায় ভর্তি করা যায় ঈশ্বরকে ?

তিন

প্রথমবার কলকাতায় আসবার পথে মাইলস্টোন দেখে ঈশ্বর কেমন সহজে ইংরেজী অঙ্ক শিখেছে, ঠাকুরদাসের মুখে কয়েকজন সেকথা শুনলেন একদিন। সকলেই একবাক্যে বললেন—তবে তো ওকে রীতিমতো ইংরেজী পড়ানো উচিত। ওকে হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে ভর্তি করে দাও, ওখানে মাইনে-টাইনে দিতে হয় না। যদি ভালো শিখতে পারে, হিন্দু কলেজে বিনে মাইনেয় পড়তে পাবে। হিন্দু কলেজে পড়লে ইংরেজীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আর, তেমন যদি না হয়, মোটামুটি শিখতে পারলেও, অনেক কাজ হবে। মোটামুটি ইংরেজী জানলে, হাতের লেখা ভালো হলে আর যেমন-তেমন জমা-খরচ বোধ থাকলে, ও অনায়াসে সাহেবের আপিসে চাকরি পেয়ে যাবে।

ঠাকুরদাস নিজে ইচ্ছামতো সংস্কৃত শিখতে পারেননি। সাধ ছিল শেখার, সাধ্য ছিল না। ইচ্ছামতো সংস্কৃত শিখতে পারেননি বলে ঠাকুরদাসের মনে বিপুল দুঃখ। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, ঈশ্বরকে রীতিমতো সংস্কৃত শেখাবেন।

অন্যরকম পরামর্শ তাই ঠাকুরদাস মেনে নিতে পারলেন না। বললেন—চাকরি করে আমার দুঃখ ঘোচাবে বলে আমি ঈশ্বরকে কলকাতায় আনিনি। আমার একান্ত ইচ্ছা, সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে ঈশ্বর দেশে গিয়ে একটা টোল খোলে।

মধুসূদন বাচস্পতি সে-সময়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তিনি ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দিলেন—আপনি যদি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়তে দেন, তাহলে ঈশ্বর আপনার ইচ্ছামতো সংস্কৃত শিখতে পারবে। আর যদি চাকরি করা ইচ্ছা হয় তো তারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে, সংস্কৃত কলেজে পড়ে যারা ল-কমিটির পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হয়, তারা আদালতে জজপণ্ডিতের কাজ পায়। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়তে দেওয়াই উচিত।

অনেক বিবেচনার পর সাব্যস্ত হল, ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হবে।

১৮২৯ সালের ১-জুন ঈশ্বর ভর্তি হল সংস্কৃত কলেজে। তখন ঈশ্বরের বয়স ন'বছর।

দিনের পর দিন বেলা ন'টার সময় ঈশ্বর বড়বাজারের বাসা থেকে বাবার সঙ্গে পটলডাঙ্গার কলেজে গেছে। ছুটির পর বেলা চারটের সময় আবার বাবা ঈশ্বরকে কলেজ থেকে বাসায় নিয়ে এসেছেন।

কিছুদিন পর বাবা বুঝলেন, এখন ঈশ্বর একা-একা বাসা থেকে কলেজে যাওয়া-আসা করতে পারবে। তাই হল। একা-একা ঈশ্বর কলেজে যায়। ছাতা মাথায় দিয়ে একা-একা একটি ছোটোখাটো মানুষ কলেজে যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হত, যেন একটি ছাতাই আপনা-আপনি হেঁটে যাচ্ছে, যেন ছাতার তলায় মানুষজন কেউ নেই।

ঈশ্বর দেখতে ছোটোখাটো। কিন্তু মাথাটি দেখতে সেই তুলনায় বেশ বড়োসড়ো। কলেজের ছেলেরা তাই ঈশ্বরকে ঠাট্টা করে। বলে—যশুরে কৈ, কসুরে জৈ। ঈশ্বর রেগে যায়। ঈশ্বর যত বেশি রাগে, ছেলেরা তত বেশি পিছনে লাগে।

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "বালক ঈশ্বরচন্দ্র সমবয়স্কদের বিদ্রূপোক্তিতে বড় বিরক্ত হইতেন। অনেক সময় তিনি রাগে রক্তমুখ হইয়া উঠিতেন; কিন্তু কথা কহিতে গিয়া আরও হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেন। তিনি তখন বড় 'তোতলা' ছিলেন। সেই জন্য সহজে সকল কথা উচ্চারিত হইত না; এবং এক একটী কথা উচ্চারণ করিতে কাল-বিলম্ব হইত; সুতরাং তাহাতে সমবয়স্ক

বালকেরা হাসির মাত্রা চড়াইয়া বিদ্রূপের মাত্রাও বাড়াইয়া দিত।”

প্রত্যেকদিন রাত্রে বাবার কাছে পড়া দিতে হয়। কণামাত্র এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষা নেই।

ঈশ্বর কখনো বৃথা সময় নষ্ট করেনি। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন ঃ “বাল্যকাল হইতেই তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) কখন বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বাসা হইতে যাতায়াতের পথে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন।”

লেখাপড়া ছাড়াও ঈশ্বরের অঢেল কাজ। সকালবেলা গঙ্গাস্নান সেরে আসবার পথে বাজার করে আসতে হয়। মশলা বাটা আছে, মাছ-তরকারি কোটা আছে তারপর। রান্নার ভারও একা ঈশ্বরের হাতে। চার-পাঁচজনের রান্না। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ঈশ্বর খেতে বসে। ফেলে-ছড়িয়ে খাওয়া বারণ, একটি ভাত পাতের পাশে পড়ে থাকলে ঠাকুরদাসের কাছে রেহাই নেই। খাওয়ার পর ঈশ্বর সকলের থালা-বাসন মাজে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে। তারপর কলেজে যায়।

ঈশ্বরেরা বড়ো গরীব। রোজ দু'বেলা ভাত জোটে না। দু'বেলা যদি বা জোটে, সব সময় পেট ভরে খাবার মতো জোটে না। অনেক সময় শুধু লবণ দিয়ে ভাত খেতে হয়। যখন মাছ-তরকারি জোটে, তখনও ঘটা করে মাছ-তরকারি খাবার উপায় নেই। মাছ-তরকারির ঝোল হল। একবেলা ভাত আর শুধু ঝোল চলল। আরেক বেলা ভাত আর তরকারি। মাছটুকু রইল পরদিনের জন্য। সেদিন ওই মাছ দিয়ে অম্বল রাঁধা হল। আর ভাত।

রান্নাঘরটা অন্ধকার। একফোঁটা রোদ পড়ে না সেখানে। তার উপর রান্নাঘরের পাশে একটা নরককুণ্ড। মলমূত্র আর ক্রিমিকীটে ভর্তি।

দুর্গন্ধ তো আছেই, তার চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার আছে একটা।

খাবার সময় ঈশ্বরকে এক ঘটি জল নিয়ে বসতে হয়। তা না হলে ভাত খাবার উপায় নেই। দলে-দলে কৃমি ঈশ্বরের থালার দিকে এগিয়ে আসে। ঘটি থেকে জল ঢেলে ঈশ্বর কৃমির দলকে ভাসিয়ে দেয়, সরিয়ে দেয়।

রান্নাঘরে আরশোলার ভারি উৎপাত।

একদিন খেতে বসে ঈশ্বর দেখল, তরকারির মধ্যে একটা আরশোলা। না, ঈশ্বর সেকথা তখন কাউকে বলেনি। যদি বলত, নিশ্চয়ই আর-সকলের খাওয়া ভণ্ডুল হয়ে যেত। কিংবা, যদি আরশোলাটাকে পাতের পাশে ফেলে দিত, নির্ঘাত কারো চোখে পড়ত। ফল একই হত, আর-সকলের খাওয়া পণ্ড হত। আর কারো যাতে অসুবিধা না হয়, আর-কেউ যাতে কিছুই টের না পায়, এমনিভাবে ঈশ্বর তরকারির সঙ্গে আরশোলাটাকেও খেয়ে ফেলল।

বাসার সকলে যখন মধ্যে মধ্যে বাড়ি চলে যেতেন, তখনো কি ঈশ্বর প্রত্যহ রান্না করত? না। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "এই সময়ে বাসার আর সকলে যখন মধ্যে মধ্যে বাটী যাইতেন, তখন তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) প্রত্যহ পাক করিতেন না; এক দিন রন্ধন করিয়া তাহাই দুই তিন দিবস আহার করিতেন।"

ঈশ্বর ভারি একগুঁয়ে। যা বলা হবে, ঠিক তার উল্টোটি করে বসে থাকবে। ঠাকুরদাসও ছেলেকে চেনেন। কাজ হাসিল করার জন্য তিনিও যেমনটি করাতে চাইতেন, ঠিক তার উল্টোটি করতে বলতেন ঈশ্বরকে।

ঠাকুরদাস বললেন—ঈশ্বর, আজ একখানা খুব পরিষ্কার কাপড় পরে যাও।

অর্থাৎ, ঠাকুরদাসের ইচ্ছা, ঈশ্বর আজ ময়লা কাপড় পরে যায়।

সেই রকমই হত। ঈশ্বর ময়লা কাপড় পরে যেত। মনে-মনে ঠাকুরদাস যা চেয়েছেন, অনেক সময় তাই হয়েছে।

কিন্তু সব সময় হয়নি। একেকদিন ঈশ্বর ধরে ফেলেছে। হয়তো

একটা কাজ আধাআধি করে ঈশ্বর বুঝতে পেরেছে যে কাজটা নিজের ইচ্ছায় হচ্ছে না, বাবার ইচ্ছায়ই হচ্ছে। হয়তো বাবা বলেছেন, 'ঈশ্বর, আজ তোমার স্নান করা হবে না।' ঈশ্বর তাড়াতাড়ি গায়ে তেল মেখে ফেলেছে। তারপর বুঝতে পেরেছে, বাবার ইচ্ছা আজ সে স্নান করে। সঙ্গে-সঙ্গে বেঁকে বসেছে। না, আজ আর কিছুতেই স্নান নয়। ঠাকুরদাস তখন ঈশ্বরকে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই ঈশ্বর তবু ডুব দিচ্ছে না : ঠাকুরদাস জোর করে ঈশ্বরকে স্নান করিয়েছেন, বিরক্ত হয়ে বলেছেন—এঁড়ে বাছুরই বটে। বাবা ঠাট্টা করে বলেছিলেন : কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন, তাঁর ঠাট্টাও মিথ্যে হবার নয়। বাবাজি আমার আস্তে-আস্তে এঁড়ে গোরুর চেয়েও একগুঁয়ে হয়ে উঠেছেন।

কারো কথা শোনে না, নিজে যা ভালো বোঝে ঈশ্বর, বরাবর তাই করে। গুরুতর লোক উপদেশ দিলেও ঈশ্বর ঘাড় বাঁকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠাকুরদাস প্রহার করেও ফল পান না, ঈশ্বর নিজের জিদ বজায় রাখবেই। সেজন্য ঠাকুরদাস ঈশ্বরের নাম দিয়েছেন—ঘাড়কেঁদো। অর্থাৎ, ঘাড় বাঁকালে সোজা হওয়ার নয়।

কাজকর্ম শেষ করে ঠাকুরদাসের বাসায় ফিরতে রাত ন'টা বেজে যেত। বাসায় ফিরে যদি ঠাকুরদাস কোনোদিন দেখতেন যে, ঈশ্বর ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রদীপ জ্বলছে, তাহলে আর নিস্তার নেই। ঘুমন্ত ঈশ্বরকে তুলে মারধোর করতেন। ঈশ্বরের কান্না শুনে ও-বাড়ির মেয়েরা ছুটে আসতেন, বলতেন—এত মার খেয়ে মরে যাবে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের বাড়িতে ব্রহ্মহত্যা করে আমাদের পাতক-গ্রস্ত করবেন না। এরকম মারধোর করতে হলে আপনি এ-বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।

মারের ভয়ে ঈশ্বর জেগে থাকত। অনেক সময় ঘুম তাড়াবার জন্য দু'চোখে প্রদীপের তেল লাগাত। যন্ত্রণায় ছটফট করত, ঘুম থাকত না চোখে। রাত জেগে পড়ত। আবার শেষরাত্রে বাবা ঈশ্বরের ঘুম ভাঙাতেন। ঈশ্বরকে মুখে-মুখে শ্লোক

শেখাতেন।

গঙ্গাস্নান সেরে এসে নিয়মিত প্রাতঃসন্ধ্যা করে ঈশ্বর।

একবার সন্ধ্যা ভুলে গেল। কিন্তু সেকথা কাউকে জানতে দিল না। সন্ধ্যা করার সময় এমনভাবে হাত-টাত নাড়ত, যেন সব কিছু ঠিকই মনে আছে।

ঈশ্বরের কাকা, নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে জানে কেন, একদিন সন্দেহ করলেন। কিন্তু সরাসরি কিছু বললেন না। ঈশ্বরকে বললেন—আমার সন্ধ্যা ভুলে গেছি। বিশেষত আমরা বিষয়ী লোক; তুমি সংস্কৃত পড়েছ, তোমার শুদ্ধ হবে, অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আবৃত্তি করো, আমি শুনতে চাই।

সব তো ভুলে গেছে, কিছুই বলতে পারল না ঈশ্বর।

কালিদাস ঠাকুরদাসকে বলে দিলেন—ঈশ্বর সন্ধ্যা সমস্ত ভুলে গেছে। মিছিমিছি কেবল হাত-টাত নেড়ে কাজ সারে।

ঠাকুরদাস বিলক্ষণ প্রহার করলেন ঈশ্বরকে। বললেন—সন্ধ্যা শেখা না হলে কিছু খেতে দেব না।

পুঁথি দেখে আবার সন্ধ্যা মুখস্থ করল ঈশ্বর।

ঠাকুরদাসের হাতে চ্যালাকাঠের মার খেয়ে ঈশ্বর একদিন পালিয়ে গিয়েছে রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। রামধন সংস্কৃত কলেজের কেরানী।

রামধন সযত্নে ঈশ্বরকে নিজের বাড়িতে রেখেছেন, খাওয়া-দাওয়া করিয়েছেন। তারপর ঈশ্বরকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের শরীর বেশ মজবুত। বেটে-খাটো বটে, কিন্তু খুব গ্যাঁটাগোঁটা। সাধুভাষায় যাকে বলে 'অবষ্টব্ধ'। গ্যাঁটাগোঁটা বলে কলেজে অনেকে ঈশ্বরকে আদর করে 'ঢিপলে' বলে ডাকে। যখন ঈশ্বর কোনো একটা দুরূহ প্রশ্নের সুন্দর উত্তর করে দেয়, কেউ-কেউ বলে—আমাদের ঢিপলে না হলে এ-রকম আর কে করে দিতে পারে।

সাকুল্যে বারো বছর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেজে পড়েছে ঈশ্বর।

অনেকবার পুরস্কার পেয়েছে, বৃত্তি পেয়েছে।

বৃত্তির টাকায় ছাত্রদের বিস্তর মিষ্টি-মিঠাই খাইয়েছে ঈশ্বর। দারোয়ানের কাছ থেকে টাকা ধার করে গরীব ছাত্রদের নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে। আর ঈশ্বর নিজে? চরকায় সুতো কেটে মা কাপড় তৈরি করে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। সেই কাপড় পরত। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পঠদ্দশায়, নিজের বাড়ীর চরখাকাটা মোটা সূতায় প্রস্তুত গুন চটের মত অনতিদীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বস্ত্র খণ্ডে কায়ক্লেশে নিজের লজ্জা নিবারণ করিয়া নিজের ছাত্রবৃত্তির টাকায় গরীব সহ-পাঠিদিগকে ভদ্রোচিত বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন; নিজের এবং নিজের প্রদত্ত পরিচ্ছদের পার্থক্য কখনও তাঁহার সুখানুভবের ব্যাঘাত জন্মায় নাই।"

পুজোর ছুটিতে ঈশ্বর যখন দেশের বাড়িতে যেত, গরীব-দুঃখীদের সাধ্যমতো সাহায্য করত। অন্যের কাপড় নেই, গামছা পরে ঈশ্বর নিজের কাপড়চোপড় এককথায় বিলিয়ে দিয়েছে।

বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বর পরম দয়ালু।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "মাতৃদেবীর অনুকরণে আত্মীয় লোকের পীড়া হইলে তাহাদের বাটীতে যাইয়া (ঈশ্বরচন্দ্র) শুশ্রূষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ কার্য্যে কিছুমাত্র ঘৃণা ছিল না। নিঃসম্পর্কীয় অর্থাৎ কোনরূপ সংশ্রব না থাকিলেও পীড়িত লোকের মলমূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। পীড়িত লোকের শুশ্রূষাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিতেন। যে সকল সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীকে অপরে স্পর্শ করিতেও ভীত হইত, তিনি নির্ভয়ে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সেইরূপ রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে ভীত হইতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে পরম দয়ালু ছিলেন। তাঁহার এবম্বিধ গুণ থাকায় তৎকালে কলেজের সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন।"

কলকাতায় যেমন, ছুটিতে বীরসিংহে গিয়েও ঈশ্বর তেমনি অন্যের দুঃখে কাতর। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "পূজার অবকাশে

দেশে আগমন করিলে যে যে প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইয়াছেন শুনিতেন, (ঈশ্বরচন্দ্র) তাহাদের বাটীতে সর্ব্বদা যাইতেন এবং তাহাদের শুশ্রূষাদি কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেন। অপর লোকে রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ঘৃণা প্রকাশ বা ক্লেশ বোধ করিত, কিন্তু অগ্রজ (ঈশ্বরচন্দ্র) যে কোন জাতীয় লোকের পীড়া হইলে সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, একারণ তৎকালে দেশস্থ লোক দাদাকে (ঈশ্বরচন্দ্র) দয়াময় বলিত। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সামান্য বিড়াল বা কুকুর মরিলেও দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিত; কোন লোক রোদন করিলে তিনিও তাহাদের সহিত রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন।”

অনেকবার পুরস্কার পেয়েছে, বৃত্তি পেয়েছে।

বৃত্তির টাকায় ছাত্রদের বিস্তর মিষ্টি-মিঠাই খাইয়েছে ঈশ্বর। দারোয়ানের কাছ থেকে টাকা ধার করে গরীব ছাত্রদের নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে। আর ঈশ্বর নিজে? চরকায় সুতো কেটে মা কাপড় তৈরি করে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। সেই কাপড় পরত। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পঠদ্দশায়, নিজের বাড়ীর চরখাকাটা মোটা সূতায় প্রস্তুত গুন চটের মত অনতিদীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বস্ত্র খণ্ডে কায়ক্লেশে নিজের লজ্জা নিবারণ করিয়া নিজের ছাত্রবৃত্তির টাকায় গরীব সহ-পাঠিদিগকে ভদ্রোচিত বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন; নিজের এবং নিজের প্রদত্ত পরিচ্ছদের পার্থক্য কখনও তাঁহার সুখানুভবের ব্যাঘাত জন্মায় নাই।"

পুজোর ছুটিতে ঈশ্বর যখন দেশের বাড়িতে যেত, গরীব-দুঃখীদের সাধ্যমতো সাহায্য করত। অন্যের কাপড় নেই, গামছা পরে ঈশ্বর নিজের কাপড়চোপড় এককথায় বিলিয়ে দিয়েছে।

বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বর পরম দয়ালু।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "মাতৃদেবীর অনুকরণে আত্মীয় লোকের পীড়া হইলে তাহাদের বাটীতে যাইয়া (ঈশ্বরচন্দ্র) শুশ্রূষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ কার্য্যে কিছুমাত্র ঘৃণা ছিল না। নিঃসম্পর্কীয় অর্থাৎ কোনরূপ সংশ্রব না থাকিলেও পীড়িত লোকের মলমূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। পীড়িত লোকের শুশ্রূষাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিতেন। যে সকল সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীকে অপরে স্পর্শ করিতেও ভীত হইত, তিনি নির্ভয়ে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সেইরূপ রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে ভীত হইতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে পরম দয়ালু ছিলেন। তাঁহার এবম্বিধ গুণ থাকায় তৎকালে কলেজের সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন।"

কলকাতায় যেমন, ছুটিতে বীরসিংহে গিয়েও ঈশ্বর তেমনি অন্যের দুঃখে কাতর। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "পূজার অবকাশে

দেশে আগমন করিলে যে যে প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইয়াছেন শুনিতেন, (ঈশ্বরচন্দ্র) তাহাদের বাটীতে সর্ব্বদা যাইতেন এবং তাহাদের শুশ্রূষাদি কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেন। অপর লোকে রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ঘৃণা প্রকাশ বা ক্লেশ বোধ করিত, কিন্তু অগ্রজ (ঈশ্বরচন্দ্র) যে কোন জাতীয় লোকের পীড়া হইলে সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, একারণ তৎকালে দেশস্থ লোক দাদাকে (ঈশ্বরচন্দ্র) দয়াময় বলিত। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সামান্য বিড়াল বা কুকুর মরিলেও দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিত ; কোন লোক রোদন করিলে তিনিও তাহাদের সহিত রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন।”

চার

সংস্কৃত কলেজে অনেক শ্রেণী।

ঈশ্বর প্রথমে ভর্তি হয়েছে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে। ১৮২৯ সালের জুন থেকে ১৮৩৩ সালের জানুআরি পর্যন্ত পড়েছে সেই শ্রেণীতে। প্রথম তিন বছরে মুগ্ধবোধ পড়া শেষ করেছে; শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত পড়েছে।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "ঈশ্বরচন্দ্র জ্যেষ্ঠ, সুতরাং বাসার সমস্ত কাজকর্ম্মের ভার তাঁহারই উপরে পড়িত। দশ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহাকে প্রত্যহ ৮।১০ জন লোকের জন্য রাঁধিতে হইত। এতদ্ভিন্ন পিতার সেবাশুশ্রূষা ও ভাইগুলির প্রতি যত্ন করিতে হইত। দিনের বেলায় ঈশ্বরচন্দ্র পাঠাভ্যাস করিবার কিছুমাত্র অবসর পাইতেন না, সুতরাং তাঁহাকে অতি অল্প বয়স হইতেই রাত্রি জাগিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে হইত।"

১৮২৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে উপস্থিত থেকেছে ৭২ দিন, অনুপস্থিত থেকেছে ১১২ দিন। সে-সময়ে কলেজের খাতায় ঈশ্বরচন্দ্রের নম্বর: ৩১০; সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি প্রাইস সাহেব, ১৮৩০ সালের ৫-ফেব্রুআরি, ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "Very well for his age."

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি প্রাইস সাহেব, ১৮৩০ সালের ৩১-জুলাই, ১৮৩০ সালের হাফ-ইয়ালি পরীক্ষার রিপোর্ট দাখিল করেছেন। সে-সময়ে কলেজের খাতায় ঈশ্বরচন্দ্রের নম্বর: ২৬৫।২; ১৮৩০ সালের প্রথম ছ'মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে উপস্থিত থেকেছে ৭৫ দিন, অনুপস্থিত থেকেছে ১০৬ দিন; রিপোর্টে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি প্রাইস সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:





জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

"Considerable progress for his age, very considerable proficiency."

ভর্তি হওয়ার দেড় বছর পর ১৮৩১ সালের মার্চ মাস থেকে ঈশ্বর মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়েছে। কৃতী ছাত্রেরা কলকাতায় বাসা-খরচের জন্য এই বৃত্তি পেত। যারা বৃত্তি পেত, তাদের বলা হত পে-স্টুডেণ্ট; যারা বৃত্তি পেত না, তাদের বলা হত আউট-স্টুডেণ্ট।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তখন ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক। ১৮২৫ সালের ১৭ই-নভেম্বর থেকে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধ তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হয়েছেন, মাইনে তিরিশ টাকা। গঙ্গাধরের বাবার নাম শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। সংস্কৃত কলেজে আসার আগে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ এম. অ্যান্‌সলি ও অন্যান্য সিভিলিয়ান সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৪৪ সালে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে: 'সেতুসংগ্রহ' নামে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা; খোসগল্পসার। "কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।"

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"পূজ্যপাদ (গঙ্গাধর) তর্কবাগীশ মহাশয়, শেষ ছয় মাস, দৈনন্দিন অধ্যাপনাকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, প্রত্যহ, এক একটি উদ্ভট শ্লোক লেখাইয়া, তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। ঐ শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিয়া, আমাদিগকে, পর দিন, তাঁহার সমক্ষে, উহার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে হইত। যদি আবৃত্তি বা ব্যাখায় কোনও ব্যতিক্রম লক্ষিত হইত, তিনি তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন। এই রূপে, ছয় মাস, আমরা প্রত্যহ এক একটি উদ্ভট শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম।

CAUTION:

Image 52 is NO longer present in scan-order!

Maybe it was deleted from outside of BCS-2 ?

উদ্ভটশ্লোকশিক্ষা বিষয়ে আমার সবিশেষ অভিনিবেশ দেখিয়া, পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমি সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার পর, তিনি আমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যহ না পার, মধ্যে মধ্যে আমার নিকটে আসিয়া, উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া লইয়া যাইবে। তদীয় এই সদয় আদেশ অনুসারে, সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়নকালে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গিয়া, উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া আনিতাম। এইরূপে, দয়াময় তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রসাদে, দুই শতের অধিক শ্লোক সঙ্গৃহীত হইয়াছিল।...

প্রাত্যহিক পাঠসমাপ্তির পর উদ্ভট শ্লোকের আলোচনা বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর অনুযায়িনী না হওয়াতে, ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে, উদ্ভটশ্লোকশিক্ষার প্রথা ছিল না। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়, ছাত্রগণের হিতার্থে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তৃতীয় শ্রেণীতে উদ্ভটশ্লোকশিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই উদ্ভটশ্লোকশিক্ষা দ্বারা, আমরা সবিশেষ উপকারলাভ করিয়াছিলাম্, তাহার সন্দেহ নাই।”

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পর-পর তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বর তিনবারই পুরস্কার পেয়েছে। ১৮৩০-৩১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে আউট-স্টুডেণ্ট হিসেবে মুগ্ধবোধ ও নগদ আট টাকা। ১৮৩১-৩২ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে অমরকোষ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস। ১৮৩২-৩৩ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে পে-স্টুডেণ্ট হিসেবে মুগ্ধবোধ ও নগদ দু’টাকা। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “(ঈশ্বরচন্দ্র) ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর পরীক্ষায় উত্তমরূপে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এক বৎসর অপর মন্দ বালক ভাল প্রাইজ পাইল দেখিয়া, তাঁহার মনে এত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, কলেজে আর অধ্যয়ন করিব না, দেশে যাইয়া দণ্ডিপুরে বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌম পিদামহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিব, এই স্থির করিয়াছিলেন। পিতৃদেব এবং তর্কবাগীশ ও মধুসূদন বাচস্পতির অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কলেজ পরিত্যাগ

করিতে পারিলেন না।”

ভালো করে লেখাপড়া শেখার জন্য ঈশ্বরের যত্নের অন্ত নেই। প্রায়ই ঠাকুরদাসকে বলত—রাত দশটার সময় খেয়ে উঠে শুয়ে পড়ব। রাত বারোটা বাজলে আপনি আমায় তুলে দেবেন, নয়তো আমার পড়া হবে না।

খেয়ে উঠে ঠাকুরদাস্ দু'ঘণ্টা বসে থাকতেন। আরমানি গির্জার ঘণ্টা শুনে ঈশ্বরকে জাগিয়ে দিতেন।

ঈশ্বর সারারাত পড়ত।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী শেখানোর জন্য ১৮২৭ সালের ১-মে থেকে ওলাস্টন নামে একজন সাহেব বহাল হয়েছেন; তাঁর মাইনে দু'শো টাকা। ১৮৩০ সালের ১৪-এপ্রিল থেকে গঙ্গাচরণ সেন ইংরেজীশ্রেণীর প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন, মাইনে পঞ্চাশ টাকা; গঙ্গাচরণের জায়গায়, ১৮৩৫ সালের মে মাস থেকে, শ্যামলাল সেন এসেছেন। ১৮৩৩ সালের ১৪-ফেব্রুআরি থেকে নবকুমার চক্রবর্তী ইংরেজীশ্রেণীর দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন, মাইনে চল্লিশ টাকা।

সংস্কৃত কলেজের সব ছাত্রকেই ইংরেজী পড়তে হবে, এমন কোনো কথা নেই, যাদের ইচ্ছা হবে তারা পড়তে পারে। ব্যাকরণ শ্রেণীতে পড়তে-পড়তেই ঈশ্বর ইংরেজীশ্রেণীতে এসেছে—১৮৩০ সালের কথা। ১৮৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র হিসেবে ঈশ্বর পুরস্কার পেয়েছে: History of Greece আর Reader etc.; ১৮৩৪-৩৫ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্র হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে: Poetical Reader No. 3 আর English Reader No. 2.

কিন্তু ১৮৩৫ সালের নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজীশ্রেণী উঠে গেল।

১৮৩৩ সালের ফেব্রুআরি থেকে ১৮৩৫ সালের জানুআরি পর্যন্ত ঈশ্বর পড়েছে সাহিত্যশ্রেণীতে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তখন সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক।

জয়গোপালের জন্ম ১৭৭৫ সালের ৭-অক্টোবর (মতান্তরে ১৭৭২ সালে) নদীয়া জেলার বজরাপুর গ্রামে। জয়গোপালের বাবার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন।

গোড়ার দিকে জয়গোপাল তিন বছর কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। তারপর ১৮০৫ সাল থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তিনি পাদরী কেরী সাহেবের অধীনে শ্রীরামপুরে কাজ করেছেন, সেই সময়েই কিছুদিন তিনি মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ১৮১৮ সালের ২৩-মে 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানা বাঙলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে, আরম্ভ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত জয়গোপাল 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্মী। ১৮২৪ সালের জানুআরি মাসে জয়গোপাল কলকাতা সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক হয়ে এলেন, মাইনে ষাট টাকা। তাঁর মাইনে বাড়তে-বাড়তে শেষ পর্যন্ত নব্বুই টাকা হয়েছে। বাইশ বছর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন জয়গোপাল।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "তাঁহার (জয়গোপাল তর্কালঙ্কার) উৎকৃষ্ট পাঠনার রীতির অনেক আখ্যায়িকা সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত আছে। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০।৬৫ বৎসরেরও অধিক হইবে, এবং যখন কলেজে আসা যাওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন বোধ হইত, তখনও কালিদাসের 'শকুন্তলা' বা ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' পড়াইবার সময়ে তিনি এমনি তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, পড়াইতে পড়াইতে ভাবাবেশে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতেন ও বর্ণিত বিষয়ের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।"

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন:

"ইনি (জয়গোপাল তর্কালঙ্কার) অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাব-গ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদ্‌গদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই

বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল ; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল,···জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যাপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্ককয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে ; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন ; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন ; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য ; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।”

শোনা যায়, জয়গোপালের শ্লোক পড়ে উইলসন সাহেব চোখের

জলে আকুল হয়েছিলেন; এবং উত্তরে জয়গোপালকে কয়েকটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন :

"বিধাতা বিশ্বনির্ম্মাতা হংসাস্তৎপ্রিয়বাহনম্।
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যতি স এব তান্॥
অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে॥
ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্য্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্ব্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্॥
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥"

(পরবর্তীকালে এই শ্লোকমালার বাঙলা অনুবাদ করেছেন পূর্ণচন্দ্র দে :

"যাহা কিছু নিরীক্ষণ কর এই ভবে,
ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে জেনো সেই সবে।
হংসও হইল তবে ব্রহ্মার রচন,
পুনশ্চ ব্রহ্মার তাহা হইল বাহন।
তাই ত ব্রহ্মার হংস দেখি প্রিয়তর,
ব্রহ্মা রক্ষা করিবেন তাঁরে নিরন্তর।
অমৃত মধুর বস্তু জানিও সতত,
তা হ'তে মধুরতর ভাষা সংস্কৃত।
তাই ত দেবতা-গণ পরম-আদরে
সংস্কৃত-ভাষা-রস পিয়ে প্রাণ-ভ'রে।
এই কথা মনে তুমি রেখো অবিরাম,—
সংস্কৃত পাইয়াছে 'দেবভাষা' নাম!
না জানি বা সংস্কৃত ভাষার কি রস,
এ রস করিলে পান সবাই অবশ।
আমরা বিদেশী লোক বিদেশে থাকিয়া
এই রস পান করি উন্মত্ত হইয়া!
থাকিবে ভারত-বর্ষ যতকাল ধরি',

থাকিবেক যতকাল বিন্ধ্য-হিম-গিরি,
গঙ্গা গোদাবরী নদী যতকাল রবে,
ততকাল 'সংস্কৃত' জীবিত রহিবে !")

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সময়ে-সময়ে ছাত্রদের সমস্যাপূরণ করতে দিয়েছেন। সমস্যাপূরণের জন্য রচিত শ্লোকগুলো একখানা খাতায় লেখা হয়েছে, খাতাখানার নাম 'সমস্যাকল্পলতা'। সংস্কৃত কলেজ থেকে খাতাখানা এনে অবিকল নকল করে জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী ১৯০০ সালে ছাপার অক্ষরে 'সমস্যাকল্পলতা' বই বের করেছেন।

'সমস্যাকল্পলতা'র ভূমিকায় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, ১৯০০ সালের ১৭-অক্টোবর, লিখেছেন : "...যৎকালে কবিত্বের ও সহৃদয়তার অবতার, দিব্যমূর্ত্তি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রাচীন বয়সে কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় অপূর্ব্ব রাগে ছাত্রগণের হৃদয়াকাশ রঞ্জিত করিতেছিলেন, এবং তাঁহার যোগ্যতম ছাত্র কবিকুল-চন্দ্র প্রেমময় প্রেমচন্দ্র পূর্ণযৌবনে উক্ত কলেজের অলঙ্কারশ্রেণীর অধ্যাপক-পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, এবং ঐ দুই মহাপুরুষের কৃতবিদ্য ছাত্র—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাত্মারা এক একটী উদীয়মান নক্ষত্রের ন্যায় নব নব প্রতিভাজ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছিলেন, সেই এক অনির্ব্বচনীয় সময়ে "সমস্যাকল্পলতা" জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ১ম দুই শ্লোক প্রেমচন্দ্রের কৃত। ১ম শ্লোক মঙ্গলাচরণ; উহার অর্থ—একপক্ষে জগদীশ্বর গোপালের, ও অন্যপক্ষে সাহিত্যগুরু জয়-গোপালের মহিমাকীর্ত্তন। দ্বিতীয় শ্লোক এইরূপ :

"কবিতা ভবিতা কস্মাদস্মাকমিতি ভাবিতঃ।
গুরুঃ সমস্যামেকৈকামারেভে দাতুমুৎসুকঃ ॥
নিত্যং তৎপূরণাদেষা জায়তে শ্লোকবিস্তৃতিঃ।
সা সমস্যাকল্পলতা—নাম্না খ্যাতাস্তু ভূতলে ॥"

অর্থাৎ—আমরা কিরূপে কবিতা-রচনায় সমর্থ হইব—এই ভাবনায় আমাদের গুরু (জয়গোপাল তর্কালঙ্কার) উৎসুকচিত্তে

আমাদিগকে এক একটি সমস্যা দিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য সেই সেই সমস্যা পূরণ করায় এই "সমস্যাকল্পলতা" উৎপন্ন হইল।"

জয়গোপালের দিদির নাম যশোদা। জয়গোপাল একদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন, যশোদা এসে বললেন—জয়গোপাল, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি তা রাখবে কি না?

জয়গোপাল কথা দিলেন যে, কথা রাখবেন।

যশোদা বললেন—এই চণ্ডীমণ্ডপে বসে প্রতিজ্ঞা করো যে কলকাতায় বাড়ি কিনবে না।

জয়গোপালকে কেন যশোদা এমন প্রতিজ্ঞা করতে বলছেন? যশোদা ব্যাখ্যা করে বললেন—তুমি আমাদের সকলের চেয়ে ছোটো, বড়ো আদরের ধন। তুমি কলকাতায় বাড়ি কিনলে আমাদের সকলকে এককালে ভুলে যাবে, আর দেশে আসবে না, আর তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাব না।

বলে যশোদা কাঁদতে লাগলেন। জয়গোপালের চোখেও জল এসে গেল। জয়গোপাল কলকাতায় বাড়ি কেনেননি; ভাড়াটে বাড়িতে থেকেই বরাবর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।

জয়গোপাল বিয়ে করেছেন গুয়াতলি গ্রামের রামকান্ত চক্রবর্তীর মেয়ে রাসমণিকে। কিছুকাল পরে রাসমণি মারা গেলেন। জয়গোপাল দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন মহেশপুর গ্রামের সদাশিব সরকারের মেয়ে উমাসুন্দরীকে। জয়গোপাল নিঃসন্তান; ১৮৪১ সালের ২৮-জানুআরি জয়গোপাল দত্তকপুত্র নিয়েছেন তারকনাথ বিদ্যানিধিকে। তারকনাথ বিদ্যানিধির পুত্র বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন: "তিনি (জয়গোপাল তর্কালঙ্কার) আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও নির্লোভ ছিলেন, তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল। পিতা মাতা ভ্রাতৃগণের ও দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু প্রভৃতি গুরুজনবর্গের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। অহঙ্কার হিংসা দ্বেষ তাঁহার মনে কখন স্থান পাইত না; ধনী কি নির্ধনী সকলের সহিত সমভাবে আলাপ করিতেন। তিনি পরোপকারক ও স্বজনবৎসল ও দানশীল ছিলেন,

কখন কাহারও সহিত বাদ বিসম্বাদ করেন নাই, কখন কাহারও মনে বেদনা দিয়া কথা বলিতেন না, তাঁহার কাছে শাক্ত বৈষ্ণবের পার্থক্যভাব ছিল না, সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই তিনি সমান ভালাবাসার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার মন অতি সরল ও কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল, কুটিলতা কাহাকে বলে আদৌ তাহা জানিতেন না।···পরের দুঃখ ও বেদনা দেখিলে হৃদয় গলিয়া যাইত, কিসে তার দুঃখ দূর করিবেন সর্ব্বক্ষণ সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইতেন।”

জয়গোপালের মাথার মধ্যিখানের চুল উঠে গিয়ে টাক পড়েছিল। তা নিয়ে একটা কাহিনী আছে।

একজন গরীব বুড়ী একদিন জয়গোপালের কাছে ভিক্ষে করতে এসেছে। জয়গোপাল ভিক্ষে দিলেন। বুড়ী খুশি হয়ে ভুল করে বলল—তোমার মাথায় যত চুল তত পরমায়ু আমার হোক।

জয়গোপাল নিজের মাথা বুড়ীকে দেখিয়ে বললেন—বুড়ী, তবেই তুমি গেছ, যদি কিছুদিন বাঁচতে তা আর বাঁচলে না।

জয়গোপাল কয়েকখানা বই রচনা বা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর অন্তত চারখানা বইয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : রামায়ণ ; মহাভারত ; পারসীক অভিধান ; বঙ্গাভিধান।

জয়গোপাল ১৮৩০-৩৪ সালে কৃত্তিবাসী রামায়ণের ও ১৮৩৬ সালে কাশীরাম দাসের মহাভারতের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

জয়গোপাল, ১৮৩৮ সালের মে মাসে, সাদারল্যাণ্ড সাহেবের কাছে আবেদন করেছেন : “আমি বঙ্গভাষাসংক্রান্ত পারসী এবং আরবী ভাষার অর্থ সাধুবঙ্গভাষাতে সঙ্কলনপূর্ব্বক পারসীক অভিধান নামে এক কোষ সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কোষে পঞ্চশতাধিক দ্বিসহস্র বিদেশীয় শব্দ অকারাদিবর্ণক্রমে সূচী করিয়া বিন্যস্ত করা গিয়াছে এই গ্রন্থে লোকের পরমোপকার হইতে পারিবেক ইহা বিজ্ঞ মহাশয়েরা দেখিলেই বিদিত হইবেন ইহাতে অনুমান অশীতিপৃষ্ঠের ন্যূন হইবে না ইহার মূল্য ১ একমুদ্রা নিরূপণ করা

গিয়াছে অতএব প্রার্থনা মহাশয়েরদের সাধারণ বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থসমাজে ইহার কিয়ত পুস্তক গ্রহণসূচক স্বাক্ষর হয় তবে আমি এই বিষয় অনায়াসে সুসম্পন্ন করিতে পারি বিজ্ঞ মহাশয়েরদের দৃষ্টিগোচরার্থ তাহার কিঞ্চিদংশ আদর্শস্বরূপ প্রেরণ করা যাইতেছে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বিহিত করিবেন কিমধিকং বিজ্ঞবরেষু।”

১৮৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে জয়গোপালের ‘পারসীক অভিধান’। ফারসী থেকে বাঙলা অভিধান। অধিকাংশই ফারসী শব্দের বাঙলা অর্থ, অল্প কিছু আরবী শব্দেরও বাঙলা অর্থ আছে। এই অভিধানে প্রায় আড়াই হাজার শব্দ আছে। জয়গোপাল এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন দু-ভাষায়ঃ বাঙলায় ও ইংরেজীতে। ইংরেজী ভূমিকা থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছিঃ “I have collected together words with great labour, and have now published this Persian Vocabulary, with the intention of substituting elegant Bengalee words, in lieu of the Persian terms, which have been in use. The wise will thus be able to see how many foreign words have got themselves into the Bengalee language, and have made themselves manifest. They will be able now, without any reference to this foreign language, to enjoy the pleasure of employing in reading and writing only their own language; and they will be delivered from the shame which follows the appropriation of another's property, while one is in possession of property of his own.”

১৮৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ‘বঙ্গাভিধান’। ১৮৩৮ সালের ২৫-আগষ্টের ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় জয়গোপাল ‘বঙ্গাভিধানে’র একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। সেই বিজ্ঞাপনটি থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছিঃ “বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য ২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং

ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান ২ স্থানে আছে এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎলোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমান যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।...এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে...। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।"

১৮৪৬ সালের ১৩-এপ্রিল জয়গোপালের মৃত্যু হয়েছে। জয়-গোপাল সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত; এবং মাতৃভাষার সুন্দর সেবা করেছেন। উত্তরকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় তাঁহার (জয়গোপাল তর্কালঙ্কার) অসাধারণ দক্ষতা ছিল। যে 'সমাচার দর্পণ' ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষার্দ্ধ হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্মে বহু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধনে সহায় হইয়াছিল, জন ক্লার্ক মার্শম্যান নামে তাহার সম্পাদক হইলেও প্রথমাবস্থায় পণ্ডিত জয়গোপালই ছিলেন তাহার স্তম্ভ। এই সংবাদপত্র মারফৎ তিনিই ঋজু কঠিন বাংলা ভাষাকে নমনীয় করিয়া আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অসাধারণ কীর্ত্তি—কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সংস্কার সাধন। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে শতাব্দীকালের

উর্দ্ধকাল কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নামাঙ্কিত যে দুইটি মহাকাব্য পঠিত ও গীত হইয়াছে, তাহার মনোহারিণী ভাষা যে জয়গোপালের, এ কথা আজ আমরা কয়জন জানি ?...সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হইয়া মাতৃভাষার জন্য তাঁহার এই বিপুল অধ্যবসায় আজ সমগ্র বাঙালী জাতিকে জয়গোপালের নিকট ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।"

সাহিত্যশ্রেণীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে পড়ার সময়েও ঈশ্বর আগের মতো মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়েছে। সাহিত্যশ্রেণীতে ঈশ্বর পড়েছে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী।

বৃত্তির টাকা ঈশ্বর তুলে দিয়েছে ঠাকুরদাসের হাতে। ঠাকুরদাস একদিন বলেছেন—তোমার এই টাকায় জমি কিনব। দেশে টোল করে দেব। দেশের লোক যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, তুমি সেই ব্যবস্থা করবে। তোমার বৃত্তির টাকায় যে জমি কেনা হবে, তার উপস্বত্বের টাকায় বিদেশী ছাত্রদের খরচের কিছু সাহায্য হতে পারবে।

কাঁচিয়াগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন ঠাকুরদাস।

কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস বললেন—তোমার টাকায় তোমার আবশ্যক বইপুঁথি কিনবে।

ঈশ্বর অনেক পুঁথি কিনেছে।

যখন বীরসিংহে যায়, কারো বাড়িতে আদ্যশ্রাদ্ধ হলে ঈশ্বরের উপর নিমন্ত্রণের কবিতা লেখার ভার পড়ে। নিমন্ত্রণে সমাগত পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যাকরণের বিচার করেন। বিচারকালে ঈশ্বর সংস্কৃতভাষায় কথা বলে। পণ্ডিতেরা আশ্চর্য হয়ে যান। ক্রমশ দেশে প্রচার হয়ে গেল যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

১৮৩৪-৩৫ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বর প্রথম হয়েছে। পুরস্কার পেয়েছে : সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ আর দু'খণ্ড

History of British India; তাছাড়া দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য পুরস্কার পেয়েছে হিতোপদেশ ও রবিনসনের Grammar of History.

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "ঐ সময় হইতে অগ্রজকে (ঈশ্বরচন্দ্র) দুই বেলা সকলের পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। কোন দাসদাসী ছিল না। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া বড়বাজার টাকশালের গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আসিবার সময় বড়বাজার কাশীনাথবাবুর বাজারে যাইতেন। তথায় বাটা মৎস্য ও আলু পটল তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পোঁছিয়া প্রথমতঃ হরিদ্রাদি ঝাল মশলা বাটিয়া উনন ধরাইয়া মুগের দাউল পাক করিয়া মৎস্যের ঝোল রন্ধন করিতেন। তখন বাসায় চারিজন লোক ভোজন করিতেন, ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিতে হইত। হাঁড়ী মাজিয়া, বাসন ধৌত করিয়া, ও স্থান মুক্ত করায় অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও নখগুলি ক্ষয় হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্য হস্তে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত।"

পাঁচ

১৮৩৫ সালের ফেব্রুআরিতে ঈশ্বর এসেছে অলঙ্কারশ্রেণীতে। অলঙ্কারশ্রেণীর অধ্যাপক তখন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।

বর্ধমানের অন্তর্গত শাকরাঢ়া বা শাকনাড়া গ্রামে ১৮০৫ সালের ১৩-এপ্রিল প্রেমচন্দ্রের জন্ম। প্রেমচন্দ্রের বাবার নাম রামনারায়ণ।

ছেলেবেলায় প্রেমচন্দ্র কিছুদিন নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের কাছে পড়েছেন। প্রেমচন্দ্রের মামাবাড়ি রঘুবাটী গ্রামে। নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর প্রেমচন্দ্র মামাবাড়িতে গেলেন, সেখানে সীতারাম ন্যায়বাগীশের টোলে ব্যাকরণ পড়তে লাগলেন। কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকা হল না। কিছুকালের মধ্যেই মামাদের সঙ্গে ঝগড়া করে প্রেমচন্দ্র বাড়িতে ফিরে এলেন।

কিছুদিন বাড়িতে বসে রইলেন প্রেমচন্দ্র। সে-সময়ে অনেক গ্রামেই তর্জার দল ছিল; দুই দলে আসরে বসে আড়াআড়িভাবে গান হত। প্রেমচন্দ্র তর্জার গান লিখে দিতেন। "কথিত আছে, রাত্রিকালে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে ঐ দলের লোকেরা প্রেমচন্দ্রের পিতার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে মহাসমাদরে স্কন্ধে লইয়া দৌড়িত এবং আসরের অনতিদূরে কাহারও ঘরের দুয়ারে বা বৃক্ষতলে বসাইয়া উত্তর-গান রচনা করাইয়া লইত।"

তারপর প্রেমচন্দ্র ভর্তি হলেন জয়গোপাল তর্কভূষণের টোলে। ভর্তি হয়েছেন বলে গান লেখা বন্ধ হয়নি, মাঝে মাঝে গান লিখেছেন।

আসরে একদলে চাষা ও তাঁতি, আরেক দলে কলু; কলুর দল চাষার দলের হরিনামগানের দোষ ধরে গান ধরেছে ঃ চাষাভুষো লোক, হাল করা ও ক্ষেতে খাটাই অভ্যাস, হরিনামের মাহাত্ম্য কী বুঝবে, হরিনামে চাষার অধিকার কী? তেরো-চোদ্দ বছর

বয়স তখন প্রেমচন্দ্রের। চাষার দলের কয়েকজন প্রেমচন্দ্রকে কাঁধে নিয়ে আসরে এসে উপস্থিত। জাঁকাল আসর, বিস্তর লোকজন, চারদিকে হৈ-হৈ। এক গাছতলায় বসে প্রেমচন্দ্র একটি গাঁন রচনা করে দিলেন ঃ

“চাষা অতি খাসা জাতি, নিন্দা কি তাহার
কত দিব্য-গুণাধার।
প্রেম্‌ভরে হরিরে ডাকৃতে চাষার পূর্ণ অধিকার॥
থাকে সত্য মাঠে ঘাটে, বেড়ায় সে স্বভাবের হাটে
চতুরালি নাহি তাহার।
কুটিল সমাজ যত্নে করে পরিহার॥
স্বার্থে পরার্থে কাজ, নিজ কাজে নাহি লাজ,
ভাবে ধর্ম্ম এই তাহার।
প্রাণপণে যোগায়, চাষা জগতের আহার॥
কিবা গৃহী উদাসীন, চাষার অধীন চির দিন,
বিনে চাষা ত্বনিয়া আঁধার।
পেটে ভাত বিহনে ঘুরিয়ে ঘানী ফল্‌ কি ভাব
একটীবার।
মনে ভক্তি আছে যার, হরি সহায় তাহার,
এ কেবল প্রেমের কারবার॥
ভক্তবৎসল হরি ভজ্‌তে নাহি জাত-বিচার।
তোমরা ঘানীর ঘোরে সদাই ঘোর ও
বুঝবে কি ভাই! সারাসার॥”

ছেলেবেলার আরেকটি সখ প্রেমচন্দ্রের—ছিপে মাছধরা।

একদিন ছিপ ফেলে প্রেমচন্দ্র দশ-পনেরোটি শোলমাছের বাচ্চা ধরেছেন। বাচ্চাগুলো মারলেন না; একটা হাঁড়িতে জিইয়ে রাখলেন। ছিপে আর মাছ উঠছে না দেখে খানিকক্ষণ পরে প্রেমচন্দ্র জলের ধারে গিয়ে দেখলেন, আর বাচ্চা নেই, একটা ধাড়ী মাছ এধার-ওধার করে বাচ্চাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সব মাছের বাচ্চা আবার

পুকুরের জলে ছেড়ে দিলেন প্রেমচন্দ্র, ধাড়ী মাছ তখন বাচ্চাগুলোর সঙ্গে মিলে গেল, বড়ো আনন্দ হল।

এবং তারপর প্রেমচন্দ্র আর কখনো মাছ ধরেননি।

তারপর প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়বার জন্য কলকাতায় এসেছেন। উইলসন সাহেব প্রেমচন্দ্রকে পরখ করে দেখেছেন। তিনি প্রেমচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছেন—তুমি সংস্কৃত কবিতা লিখতে জানো?

তক্ষুনি কয়েকটি শ্লোক লিখে উইলসন সাহেবের হাতে দিলেন প্রেমচন্দ্র :

"ভবান্ ধন্যঃ শ্রীহোরেস-উইল্সন—সরস্বতি।
লক্ষ্মীবাণীচিরদ্বন্দ্বং ভবতৈব নিরাকৃতম্॥
শ্রীসংস্কৃতকলেজস্য ভিত্তিস্ত্বং শ্রীউইল্সন।
শ্রীগোপালনিমাইশম্ভুনাথুস্তম্ভচতুষ্টয়ম্॥
গঙ্গাধরযোগধ্যানহরনাথা ইমে ত্রয়ঃ।
ছাদাঃ সুনির্ম্মিতা নিত্যং চতুঃস্তম্ভোপরি স্থিতাঃ॥
কোম্পানেরখিলক্ষমাতলভৃতঃ সম্মানিতো বিশ্রুতঃ
শ্রীযুক্তো জগতীতলে বিজয়তামুইল্সনঃ সাহবঃ।
যস্যানন্তগুণাবলীবিলসিতং প্রেক্ষাবতাং প্রাতিদং
মন্যে মন্থরতাং ব্রজন্তি ভণিতুং বাচোঽপি বাচস্পতেঃ॥"

(পরবর্তীকালে এই শ্লোকমালার বাঙলা অনুবাদ করেছেন পূর্ণচন্দ্র দে :

"শ্রীহোরেস উইল্সন্ সরস্বতী তুমি,
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি,—বুঝিলাম আমি।
লক্ষ্মী সরস্বতী,—দুয়ে শত্রু বারমাস,
একত্র, তোমারি গুণে, করিছেন বাস!
সংস্কৃত-কলেজের ভিত্তি উইল্সন্,
তদুপরি চারি স্তম্ভ স্থিত সর্বক্ষণ,—
শ্রীজয়গোপাল, নিমাইচাঁদ মহামতি,

সবিনয় নিবেদন—

গতকল্য [illegible]— [illegible]
যে— দুটি [illegible]— [illegible] ও [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
১৬ [illegible] ৪০ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ভবদীয়
[illegible]
[illegible]

[illegible]

নাথুরাম শাস্ত্রী, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি।
যোগধ্যান, হরনাথ, আর গঙ্গাধর,—
এই তিন ছাদ চারি স্তম্ভের উপর!
এই পরিদৃশ্যমান নিখিল ধরণী
যার অধিপতি 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী'।
এই কোম্পানীর সদা সম্মানিত অতি
হোরেস্ হেম্যান্ উইল্সন্ মহামতি।
তাঁহার অসীম গুণ কি কহিব আর,
জয় জয় জয় তাঁর জয় অনিবার।
বর্ণিতে তাঁহার গুণ দেব বৃহস্পতি
থতমত খেয়ে যান্,—হেন মোর মতি!")

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি প্রেমচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—আগে তুমি কোন অধ্যাপকের কাছে পড়াশোনা করেছ?

প্রেমচন্দ্র হাসলেন। এবং একটি শ্লোক লিখে উত্তর দিলেন:

"গোপালৌ দ্বৌ জয়ৌ দ্বৌ চ দ্বাবেব তর্কমণ্ডনৌ।
মথুরাধিপ একো হি বৃন্দাবনাধিপোঽপর:।"

অর্থাৎ—দুজনেই 'গোপাল', দুজনেই 'জয়', দুজনেই 'তর্কমণ্ডন'; একজন 'গোপাল' মথুরায়, আরেকজন বৃন্দাবনে।

সংস্কৃত কলেজে প্রেমচন্দ্র ১৮২৭ সালের আগস্ট থেকে ১৮২৮ সালের জানুআরি পর্যন্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্য পড়েছেন; ১৮২৮ সালের ফেব্রুআরি থেকে ১৮২৯ সালের জানুআরি পর্যন্ত নাথুরাম শাস্ত্রীর কাছে অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েছেন; ১৮২৯ সালের ফেব্রুআরি থেকে ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নিমাইচন্দ্র শিরোমণির কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়েছেন।

১৮২৭ সালের জুলাই মাসে গুজরাটী পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত অধ্যাপনা করবার পর নাথুরাম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং ছ'মাসের ছুটি নিয়েছেন। ১৮৩১ সালের

সেপ্টেম্বর মাস থেকে নাথুরামের জায়গায় প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। প্রেমচন্দ্র তখন ওই কলেজেই ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্র।

১৮৩২ সালের ফেব্রুআরি মাসে নাথুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তারপর প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন।

পড়াতে পড়াতে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মতো ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "তিনি (প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ) কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন—

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা॥

তখনই আহা, হা, করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।"

ছেলেবেলায় গানের দিকে টান ছিল, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েও প্রেমচন্দ্রের গানের টান কমেনি। "সংস্কৃত বিদ্যালয়ে কর্ম্ম পাইবার পরে নিজ বাটীতে উৎসব উপলক্ষে অপর সকলে যখন "যাত্রা" "যাত্রা" বলিয়া ক্ষেপিত, তখন তিনি (প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ) গোপনে আপন সহচরদিগকে পাঠাইয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে ওস্তাদি কবির দল আনাইয়া আসরে লাগাইয়া দিতেন। যাত্রা পাওয়া গেল না, আসর ফাঁক থাকা অপেক্ষা কবি মন্দ কি? বলিয়া সহচরেরা বলিত। তিনিও তাহাতে সায় দিতেন। রাত্রিকালে গাওনা আরম্ভ হইলে তর্কবাগীশকে বাটীর প্রকাশ্য স্থানে কেহ খুঁজিয়া পাইত না। বাটীর মধ্যে যেখানে কম আলোক থাকিত এবং যেখানে ছোট লোকেরা নারিকেল-ছোবড়ার লুটী গেলাসের বা লণ্ঠনের জ্বলন্ত শিখায় ধরাইয়া গুড়ুক টানিত, তথায় একটী আসন পাড়াইয়া দুই চারিটী সহচর সঙ্গে তর্কবাগীশ অপ্রকাশ্যভাবে

বসিতেন এবং সময়ে সময়ে উভয় দলের গীতরচকদিগকে নিকটে ডাকাইয়া কি প্রণালীতে উত্তর প্রত্যুত্তর রচিত হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্ধান লইতেন এবং সহায়তা করিতেন। কবিগাওনা শুনা অপেক্ষা তাহার রচনাতে তাঁহার অধিক আমোদ জন্মিত। গাওনার সময়ে দুই একটী ভাবসূচক কথা শুনিয়া যখন আমোদ চড়িত, তখন মৃদুমন্দস্বরে "হাঃ সাবাস" বলিয়া উঠিতেন।"

হোরেস হেম্যান উইলসন সংস্কৃত কলেজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি এদেশ থেকে বিলাতে চলে যাবার কিছুকাল পরে, আগেই বলা হয়েছে, মেকলে সাহেবের প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজ বন্ধ করে দেবার কথা ওঠে। সে-সময়ে প্রেমচন্দ্র উইলসন সাহেবকে একটি শ্লোক রচনা করে পাঠিয়েছেন:

"গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলে ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥"

অর্থাৎ—কলকাতা নগরীতে গোলদীঘির বহুবিটপি-শোভিত তটে সংস্কৃতপঠনগৃহ নামে একটি কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ নিঃসঙ্গভাবে বর্তমান আছে। সম্প্রতি মেকলে নামে ব্যাধরাজ তীক্ষ্ণ শর ধারণ করে ভীতচিত্ত সেই কুরঙ্গকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তা দেখে সেই কুরঙ্গ সাশ্রু নয়নে বলছে—ভো ভো মহাভাগ উইলসন, আমাকে রক্ষা করো, রক্ষা করো।

উত্তরে উইলসন সাহেবও একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছেন:

"নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্‌বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে ॥"

অর্থাৎ—নিরন্তর বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট হয়, সূর্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য কিরণমালায় সন্তপ্ত হয়, সতত ছাগাদি পশু দ্বারা চর্বিত হয় এবং কোদাল দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়, তবু কৃশকায় দূর্বা মরে

না ; কেননা দুর্বলের প্রতি বিধাতার কৃপা বর্ষিত হয়ে থাকে।

প্রেমচন্দ্র প্রায় বত্রিশ বছর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৮৬৪ সালের ১-ফেব্রুআরি থেকে প্রেমচন্দ্র পেনসন নিয়েছেন, পেনসন পেয়েছেন মাসে পঞ্চাশ টাকা। শেষজীবনে প্রেমচন্দ্র কাশীবাসী হয়েছেন।

কাশীতে, ১৮৬৭ সালের ২৫-এপ্রিল, প্রেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে।

কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের পরিচয় হয়েছে। প্রেমচন্দ্র বহুদিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে ওস্তাদি কবিওয়ালাদের লড়াই দেখতে গিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১৮৩১ সালের ২৮-জানুআরি, 'সংবাদ প্রভাকর' নামে সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রেমচন্দ্রের বিস্তর বাঙলা রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার শিরোদেশে প্রেমচন্দ্রের লেখা শ্লোক ছাপানো থাকত :

"॥ সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষুসমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতিভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥
॥০০০॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামং
ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥০০০॥
॥০০০॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকরকর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং
দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥০০০॥"

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার জন্ম হয়েছে ১৮৩৯ সালের মার্চ মাসে। সম্পাদক—শ্রীনাথ রায়। কিন্তু মূলে পরিচালক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ১৮৪৫ সালের ১৮-মার্চ থেকে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার কণ্ঠদেশে প্রেমচন্দ্রের লেখা একটি সংস্কৃত কবিতা ছাপানো হত :

"ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্থ নায়ংক্ষণো
দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ ন তেহবস্থান মত্রোচিতম্।
ভোঃ ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর
পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥"

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশিত

হয়েছে ১৮৫৮ সালের ১৮-জানুআরি। 'কলিকাতা বার্ত্তাবহে'র শিরোভাগে প্রেমচন্দ্রের লেখা একটি সংস্কৃত কবিতা ছাপানো হত। কবিতাটির প্রথম পংক্তি : কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রাভাকরী চাতুরী।

সংস্কৃত কবিতা রচনায় প্রেমচন্দ্র নিপুণ। প্রেমচন্দ্রের লেখা সংস্কৃত কবিতার দু'টি নমুনা তুলে দিচ্ছি।

প্রেমচন্দ্রের লেখা একটি শ্লোক :

"গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালে তু শর্ব্বরী।
পরোপতাপিনঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ ॥"

(পরবর্তীকালে তারাকুমার কবিরত্ন এই শ্লোকটির বাঙলা অনুবাদ করেছেন :

"দিবাভাগ দীর্ঘ হয় গ্রীষ্মের সময়,
দারুণ শীতের রাত্রি দীর্ঘকাল রয় ;
লোকের পীড়নকারী যারা দুরাশয়,
তারাই জগতে প্রায় দীর্ঘকাল রয়।")

প্রেমচন্দ্রের লেখা আরেকটি শ্লোক :

"মাকন্দং মকরন্দতুন্দিলমমুং গাহস্ব কাকঃ স্বয়ম্
কর্ণারুন্তুদমন্তরেণ রণিতং ত্বাং মন্মহে কোকিলম্।
রম্যাণি স্থলসৌষ্ঠবেন কতিচিদ বস্তূনি কস্তূরিকাম্
নেপালক্ষিতিপালভালমিলিতে পঙ্কে ন শঙ্কেত কঃ ॥"

(পরবর্তীকালে তারাকুমার কবিরত্ন এই শ্লোকটির বাঙলা অনুবাদ করেছেন :

"মধুরসে পূর্ণ এই আম্র তরুবর,
স্বচ্ছন্দে বৈস হে কাক! ইহার উপর ;
যাবৎ কঠোর তব রব না শুনিব,
তাবৎ কোকিল বলি' তোমারে ভাবিব ;
আম্রবৃক্ষে কাকেরেও কোকিল দেখায়,
ক্ষুদ্রও স্থানের গুণে উচ্চনাম পায় ;

নেপালরাজের ভালে পঙ্ক যদি রয়,
লোকে তারে মৃগনাভি বলিবে নিশ্চয় (১)।”)

কে একজন একদিন প্রেমচন্দ্রকে একটি শ্লোকাংশ (“ধাতুর্হি রক্ষ্যং জগৎ”) পূরণ করতে দেন। প্রেমচন্দ্রও তখনি একটি শ্লোক রচনা করে দিয়েছেন :

“অন্তঃসেচনভূমিকর্ষণতৃণাদ্যুৎসারণাতৎপরৈঃ
উদ্যানেষু বিভান্ত নাম তরবঃ সম্যালিকৈঃ
পালিতাঃ।
সেক্তা নাপি ন কর্ষকোঽপি ন পুনঃ কশ্চিত্তথা
পালকঃ
মোদন্তে চ তথাপি বন্যতরবো ধাতুর্হি রক্ষ্যং
জগৎ ॥”

(পরবর্তীকালে এই শ্লোকটির বাঙলা অনুবাদ করেছেন তারাকুমার কবিরত্ন :

“বাগানের গাছগুলি বাড়াবার তরে,
ভাল ভাল মালি সব কত যত্ন করে ;
বেড়া বাঁধে, জল দেয়, করে করষণ,
প্রাণপণে করে তার বিঘ্ন নিবারণ ;
কিন্তু দেখ ! বনমাঝে কেবা আছে মালি,
কে করে কর্ষণ কেবা জল দেয় ঢালি ;
তবু দেখ ! বন্য তরু শোভে ফলভরে,
বিধিই করেন রক্ষা মানুষে কি করে ?”)

আরেকটি শ্লোকাংশ- (“হা হা হতশ্চাতকঃ”) প্রেমচন্দ্র পূরণ করেছেন :

“ত্বামেবাভ্যুদিতং নিরীক্ষ্য দুরবগ্রাহোগ্রতাপাকুলঃ
ক্ষামানুৎক্রমণোন্মুখান্ কথমপি প্রাণানহং ধারয়ে।

---

(১) নেপালদেশ মৃগনাভির জন্য প্রসিদ্ধ।

ত্বঞ্চেদঞ্চসি বারিবাহ বহতো বাতস্য দুশ্চেষ্টয়া
বৈমুখ্যং তদহো ত্বদেকগতিকো হাহা হতশ্চাতকঃ ॥"

(পরবর্তীকালে এই শ্লোকটির বাঙলা অনুবাদ করেছেন তারাকুমার কবিরত্ন :

"কঠোর নিদাঘ-তাপে জ্বলি' অবিরত,
ক্ষীণ মোর প্রাণ-বায়ু হৈল ওষ্ঠাগত ;
হে মেঘ ! তোমারি বারি করিবারে পান,
তোমারেই হেরি' কষ্টে রেখেছি এ প্রাণ ;
তাহে যদি তুমি দুষ্ট বায়ুর চেষ্টায়,
নিতান্ত বিমুখ আজি হও হে আমায় ;
তবে আর অভাগার কে আছে আশ্রয়,
মরিল চাতক হায় ! মরিল নিশ্চয় !")

আরো একটি শ্লোকাংশ ("ভেকেহ মূকো ভব") প্রেমচন্দ্র পূরণ করেছেন :

"অস্মিন্ পদ্মপরাগপিঞ্জরপয়ঃস্বচ্ছাশয়ে সাম্প্রতম্
গুঞ্জন্তো মধুরং হরন্তি মধুপাশ্চিত্তং নৃণাং শৃন্বতাম্ ।
নৈতৎ পল্বলমঙ্গ পঙ্কিলজলপ্রোদ্ভূতকুম্ভীকুলম্
ন ত্বেবাস্তি তবাত্র গানরসিকো ভেকেহ মূকো ভব ॥"

(পরবর্তীকালে এই শ্লোকটির বাঙলা অনুবাদ করেছেন তারাকুমার কবিরত্ন :

"এ যে রম্য সরোবর অতি নিরমল,
অপূর্ব্ব পরাগ-রাগে শোভিছে কমল ;
মধুপ মধুর তানে করিতেছে গান,
হরণ করিছে সবাকার মনপ্রাণ ;
যার জলে পানাগুলা ভাসে অবিরল,
এ নহে সে পঙ্কভরা বিকৃত পল্বল ; (১)

---

১ 'পল্বল'—ডোবা।

তোমার গানের হেথা শ্রোতা কেহ নাই,
তাই বলি ওহে ভেক! চুপ কর ভাই!")

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা-পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।"

প্রেমচন্দ্র, ১৮৩৫ সালের ১১-এপ্রিল, জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের সেক্রেটারি সাদারল্যাণ্ড সাহেবের কাছে একখানা দরখাস্ত করেছেন। সেই দরখাস্ত থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি:

"By a Resolution lately passed by the Committee of Public Instruction your petitioner has been given to understand that the publication of Sanscrit works has been put to an end by which it is to be included that there will be no further occasion for continuing the preparation of the notes of the Naisada; and upon this conviction he has given up that taste. Your petitioner therefore plays that in consideration of his labour and the time he has devoted in the service of the committee in preparing the notes of the works above referred to a suitable reward may be made to him."

প্রেমচন্দ্র অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেছেন; অন্তত কয়েকখানা টীকার নাম জেনে রাখা ভালো: রঘুবংশের টীকা; নৈষধচরিতং, পূর্ব্বভাগঃ; অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (গৌড়ীয় পাঠ); উত্তররামচরিতম্; কুমারসম্ভবম্, অষ্টমঃ সর্গঃ।

অলঙ্কারশ্রেণীতে ঈশ্বরকে পড়তে হয়েছে সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর। ১৮৩৫-৩৬ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ঈশ্বর পুরস্কার পেয়েছে রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্বশী ও মৃচ্ছকটিক।

দু'বেলা রান্না করতে হয় ঈশ্বরকে; রান্না করতে-করতে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে পড়ে। কলেজে যাওয়ার সময় পথে বই দেখতে-দেখতে যায়।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "(ঈশ্বরচন্দ্র) এক দিন মধ্যম

সহোদর দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিকা অতীত হইতে যায় তথাপি দীনবন্ধু বাসায় উপস্থিত না হওয়াতে, তাহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল। ভ্রাতার জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, অবশেষে অন্যান্য লোকের উপদেশানুসারে প্রথমতঃ বড়বাজারে কাশীনাথবাবুর বাজারে অনুসন্ধান করিলেন। তথায় অনুসন্ধান না পাওয়ায় পরিশেষে যোড়াসাঁকো নূতন বাজারে অনুসন্ধান করেন; তথায় দেখিলেন, দীনবন্ধু বাজারে দেওয়াল ঠেস দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া যান। অগ্রজ মহাশয় (ঈশ্বরচন্দ্র) ছোট ছোট ভাই ও ভগিনীদিগকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ অপর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

অলঙ্কারশ্রেণীতে পড়বার সময় ঈশ্বর প্রত্যহ কলেজ ছুটির পর, বিকেল চারটের সময়, ঠনঠনে চৌরাস্তার কাছে তারাকান্ত বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও মধুসূদন বাচস্পতির বাসায় যেত। তাঁরা তাকে খুব স্নেহ করতেন। সেখানে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাহিত্যদর্পণ দেখত।

একদিন সেই বাসায় প্রখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এসেছেন। ঈশ্বরকে সাহিত্যদর্পণ পড়তে দেখে তিনি বাচস্পতিকে জিজ্ঞেস করলেন—এই অল্পবয়স্ক বালক কি সাহিত্যদর্পণ বুঝতে পারে?

বাচস্পতি বললেন—কীরকম শিখেছে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

সাহিত্যদর্পণের রসের বিচারস্থল জিজ্ঞেস করা হল। ঈশ্বরের ব্যাখ্যা শুনে জয়নারায়ণ আশ্চর্য হয়ে বললেন—এই বালক বড়ো হলে বাঙলাদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক হবে। এত অল্পবয়সে সংস্কৃতভাষায় এমন পণ্ডিত আমি কখনো দেখিনি।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি বললেন—আমরা এই বালককে কলেজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করে থাকি।

ছয়

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ যোগসাধন করতেন। যোগবলে প্রেমচন্দ্র নাকি আসন থেকে একটু উপরে উঠতে পারতেন। যোগ-টোগের দিকে নজর গেল ঈশ্বরের। আর দু-জন বন্ধুর সঙ্গে ঈশ্বর নিশ্বাস বন্ধ করে ঠনঠনে কালীবাড়ি থেকে সংস্কৃত কলেজ অবধি যেতে আরম্ভ করল।

আশ্চর্য একটা ঘটনা হল একদিন প্রেমচন্দ্রের একখানা পুঁথি নিয়ে।

প্রেমচন্দ্রের একখানা হাতে-লেখা পুঁথি ছিল। 'সাহিত্যদর্পণে'র একখানা টীকা। ছাত্রদের কাজে লাগে বলে পুঁথিখানা তিনি কলেজেই রেখে যেতেন।

ছাত্রেরা পুঁথির এখান-ওখান থেকে পাতা খুলে নিয়ে যেত। পড়ানোর সময় কখনো-কখনো দরকার হলে পুঁথির অনেক পাতা মিলত না।

এ তো ভালো কথা নয়। প্রেমচন্দ্র ছাত্রদের বারণ করে দিলেন—পুঁথির পাতা যেন আর কেউ বাড়িতে নিয়ে না যায়।

দিনকয়েক পরের কথা। বিকেলবেলা। কী একটা কাজে, একটু আগেই কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন প্রেমচন্দ্র। খানিকক্ষণ আগে জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এদিকে ঈশ্বর একটা কাণ্ড করে বসেছে। পুঁথির পাতা বাড়িতে নিয়ে যেতে বারণ করে দিয়েছেন প্রেমচন্দ্র, বারণ না শুনে ঈশ্বর সেই পুঁথির কয়েকখানা পাতা খুলে নিয়ে বাসায় যাচ্ছে।

কিন্তু বৃষ্টি হয়ে গিয়েই সর্বনাশ হল। পা পিছলে পড়ে গেল ঈশ্বর, জলে নিজের কাপড় ভিজে গেল, বইপত্র ভিজে গেল, পুঁথির পাতাগুলোও ভিজে গেল। তাড়াতাড়ি এক ভুনোওয়ালার দোকানে

ঢুকে পড়ল ঈশ্বর, জ্বলন্ত উনুনের একপাশে নিজের ভিজে চাদরের খানিকটা বিছিয়ে দিল, আর তারই উপরে শুকোতে দিল পুঁথির পাতাগুলো।

ওই অবস্থায় প্রেমচন্দ্রের চোখে পড়ে গেল। প্রেমচন্দ্র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি ঈশ্বর ?

ঈশ্বর একেবারে তটস্থ।

সব কথা খুলে বলল। কিছুই রাখল না, কিছুই ঢাকল না। তারপর অনুতাপ করে বলল—গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল হাতে-হাতে পেলাম।

সে-বিষয়ে একটি কথাও প্রেমচন্দ্র বললেন না। তিনি বললেন —তুমি ভিজে কাপড়ে অনেকক্ষণ আছ। অসুখ করবে। এখানা পরে নাও।

বলে নিজের চাদরখানা ঈশ্বরের গায়ে ফেলে দিলেন।

ঈশ্বর কিছুতেই সেই চাদর পরতে রাজী হল না। শেষপর্যন্ত প্রেমচন্দ্র একখানা গাড়ি যোগাড় করলেন, ঈশ্বরকে সঙ্গে করে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ঈশ্বর ভিজে কাপড় ছাড়ল।

পরদিন কলেজে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করল—আর কখনো গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করব না।

১৮৩৬ সালের মে থেকে ১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঈশ্বর পড়েছে বেদান্তশ্রেণীতে।

এতদিন মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পাচ্ছিল ঈশ্বর, ১৮৩৬ সালের মে মাস থেকে টাকার অঙ্ক বেড়ে গেল, মাসিক আট টাকা আট আনা ছ পাই বৃত্তি হল। সংস্কৃত কলেজের অ্যাক্টিং সেক্রেটারি রাজা রাধাকান্ত দেব, ১৮৩৭ সালের ২৭-মার্চ, লিখেছেন: "The following students (Ishwarachandra and Madanamohana) deserve prizes for their acquirement in elementary knowledge of the Vedanta philosophy." ১৮৩৭-৩৮ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ঈশ্বর পুরস্কার পেয়েছে: মনু; প্রবোধচন্দ্রোদয়; অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব; এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "ঐ সময় জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীর সম্মুখে তিলকচন্দ্র ঘোষের সোণা রূপার খোদাইখানার গৃহ ছিল, তিলকচন্দ্র ঘোষ ও উহার পুত্র রামকুমার ঘোষ অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে (ঈশ্বরচন্দ্র) অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ঐ বাটীর উপরের গৃহে পিতৃব্য কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রিতে শয়ন করিতেন; উহার নিম্নস্থ গৃহে অগ্রজ মহাশয় (ঈশ্বরচন্দ্র) রাত্রিতে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন করিতেন। সন্ধ্যার সময় হইতে তাঁহার শয্যায় আমিও শয়ন করিতাম। এক দিবস আমার উদরাময় হওয়ায় সন্ধ্যার সময় অসাবধানপ্রযুক্ত বস্ত্রেই মলত্যাগ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য যদি ভোজন করিতে না দেন, এই আশঙ্কায় উহা প্রকাশ করি নাই। অধিক রাত্রিতে অগ্রজ মহাশয় শয়ন করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার পীঠ, বুক, হস্ত প্রভৃতিতে বিষ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে। আমায় কোন কথা না বলিয়া গাত্র ধৌত করিয়া সমস্ত শয্যা স্বহস্তে কূপোদক দ্বারা প্রক্ষালিত করিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের যথেষ্ট স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। এরূপ পিতৃমাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ অন্য কেহ করিতে পারেন না। জননীরও সকল পুত্র অপেক্ষা অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ছিল।"

ভাইবোনের উপর ঈশ্বরের যেমন অপার স্নেহ-ভালবাসা, মা-বাবার উপর ঈশ্বরের তেমনি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই প্রতিমা পূজার তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আস্থাবান হিন্দুগণ যেরূপ ভক্তিসহকারে দেবপূজা করিতেন, তিনি সেইরূপ ভক্তিসহকারে নিজ জনকজননীর পূজা করিতেন। তিনি বলিতেন, সংসারে পিতা মাতা জীবন্ত দেবতা। পিতৃ-মাতৃ-পূজা ত্যাগ করিয়া বা পিতা মাতার প্রতি—তাঁহাদের নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের প্রতি—উদাসীন হইয়া, দেব-পূজায় ধর্ম্ম হয় না। যাঁহাদের দুঃখকষ্টে আমরা লালিত পালিত,

যাঁহাদের স্নেহ মমতায় আমরা সুরক্ষিত, সেই পিতা মাতাই পরম দেবতা-স্থানীয়। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার পূজায় ধর্ম্ম হয় না।"

বেদান্তশ্রেণীর অধ্যাপকের নাম শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি। ১৮২৬ সালের মে মাসে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে বেদান্তশ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, মাইনে আশি টাকা। তার আগে প্রায় তিন বছর তিনি উইলসন সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামে। কলকাতায় টালার বাগানে তাঁর চতুষ্পাঠী ছিল; সেখানে ছ-জন ছাত্র ছিল। কেবল বেদান্ত-শাস্ত্র নয়, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। বেদান্তশ্রেণীতে ছাত্র বেশি ছিল না বলে কিছুকাল তিনি সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রও পড়িয়েছেন। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ১৮২৯ সালে সদানন্দের 'বেদান্তসারে'র সংশোধিত সটীক সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করেছেন।

শম্ভুচন্দ্রের তখন অনেক বয়স হয়েছে। শরীরের এমন দশা যে একা-একা সংসারের জরুরী কাজকর্মও করে উঠতে পারেন না। সব কাজেই তাঁকে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্রের সেবা-শুশ্রূষা করেছে।

ঈশ্বরকে ভালোবাসেন বললে কিছুই বলা হয় না, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন শম্ভুচন্দ্র। ঈশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ না করে সংসারের কোনো কাজই তিনি করেন না।

কারা যেন শম্ভুচন্দ্রকে বুদ্ধি দিয়েছেন—আপনার এত কষ্ট, এত সব অসুবিধা, সংসারে কেউ নেই আপনার, আপনি আরেকটা বিয়ে করুন। তাহলেই সুরাহা হয়, বৌ এসে আপনার দেখাশোনা করতে পারে।

গরীব বামুনের একটি সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেল। একটি অল্পবয়সী মেয়ে।

শম্ভুচন্দ্র একদিন ঈশ্বরকে বললেন—দ্যাখো, সংসারে আমার কেউ নেই। বড়ো কষ্ট পাচ্ছি। লোকে বলে, আবার বিয়ে

করলেই তো অনেক দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যায়। একটি মেয়েও পাওয়া গিয়েছে। এখন তোমার মত হলেই, বাবা, আমি একাজে এগোতে পারি।

মন দিয়ে শম্ভুচন্দ্রের সব কথা শুনল ঈশ্বর। কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের কথায় সায় দিতে পারল না। শম্ভুচন্দ্র তো বুড়ো হয়েছেন, দুদিন বাদেই মরে যাবেন, কিন্তু, হয়, সেই অল্পবয়সী মেয়েটির কী দশা হবে। বিধবা হয়ে চিরকাল দুঃখে-কষ্টে কাটাতে হবে তাঁকে। অচেনা-অজানা একটি মেয়ের ভবিষ্যতের দুঃখে ঈশ্বরের মন অপার করুণায় ভরে উঠল।

ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্রকে বলল—এই বুড়ো বয়সে নতুন করে সংসার করা আপনার কিছুতেই উচিত না। আপনার আর বেশিদিন বাঁচার আশা নেই। বিয়ে করা তো দূরের কথা, বিয়ে করার কথা ভাবলেও আপনার পাপ হবে।

ঈশ্বরের মত আদায় করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন শম্ভুচন্দ্র। ঈশ্বরের দু-হাত ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছেন পর্যন্ত। কিন্তু কিছুতেই ঈশ্বর মত দিতে পারেনি।

শম্ভুচন্দ্র অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছেন। বুড়ো বয়সে একটি নিতান্ত অল্পবয়সী মেয়েকে সংসারে এনেছেন। ঈশ্বর তো আর তখন বিয়ে বন্ধ করতে পারে না। সে কেবল দুঃখ পেতে পারে। এই ঘটনায় নিদারুণ দুঃখ পেয়েছে ঈশ্বর।

কিছুদিন পরের কথা। শম্ভুচন্দ্র বললেন—ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিনও দেখতে গেলে না?

গুরুপত্নী জননী। অতএব শম্ভুচন্দ্রের নতুন বৌ ঈশ্বরের মা বৈকি। কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের কথার কোনো জবাব দিল না ঈশ্বর। তার দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

তারপর একদিন ঈশ্বরকে জোর করে নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় সংস্কৃত কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে দুটি টাকা নিয়ে গিয়েছে ঈশ্বর।

মুখ দেখল না একটিবার, উদ্দেশে প্রণাম করে শম্ভুচন্দ্রের বৌয়ের

পায়ের কাছে টাকা দুটি রাখল ঈশ্বর। তাড়াতাড়ি চলে আসছে সেখান থেকে, এমন সময় শম্ভুচন্দ্র ঈশ্বরের হাত ধরে বললেন—তোমার মাকে দেখে যাও।

বাড়ির ঝিকে শম্ভুচন্দ্র নতুন বৌয়ের ঘোমটা খুলে দিতে বললেন। নতুন বৌ দেখে ঈশ্বর আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। শম্ভুচন্দ্র তো বুড়ো হয়েছেন, দুদিন বাদেই মরে যাবেন, কিন্তু, হায়, এই অল্পবয়সী বৌটির কী দশা হবে। বিধবা হয়ে সারাজীবন দুঃখে-কষ্টে কাটাতে হবে। সেই পরম দুঃখের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঈশ্বর কাঁদতে লাগল।

শম্ভুচন্দ্র বললেন—অকল্যাণ করিস না রে।

বলে তিনি ঈশ্বরকে সরিয়ে নিয়ে এলেন আরেকদিকে। নানা কথায় ঈশ্বরকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন শম্ভুচন্দ্র। শেষে একটু জল-টল খেতে বললেন ঈশ্বরকে।

কিন্তু কিছুই খেল না ঈশ্বর। বলল—এ-ভিটেয় আর কখনো জলস্পর্শ করব না।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির মৃত্যু হয়েছে ১৮৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

সাত

সংস্কৃত কলেজের জন্ম থেকেই হরনাথ তর্কভূষণ ব্যাকরণের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, মাইনে চল্লিশ টাকা। হরনাথ পাশ্চাত্য বৈদিক বংশের সন্তান ; যশোহর-বারইখালীর পণ্ডিত রামরত্ন তর্ক-চূড়ামণির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও ছাত্র। মুগ্ধবোধ প্রথম শ্রেণীতে দু-জন পণ্ডিত ; হরনাথ তর্কভূষণ ছিলেন প্রধান পণ্ডিত। মাঝে-মাঝে হরনাথ তর্কভূষণ অন্যান্য শ্রেণীতেও অধ্যাপনা করেছেন। প্রায় কুড়ি বছর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন হরনাথ তর্কভূষণ।

১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগে ঈশ্বরকে দেখা গেল স্মৃতিশ্রেণীতে। ঈশ্বর এক বছর পড়েছে এই শ্রেণীতে এবং আগের মতো মাসিক আট টাকা আট আনা ছ পাই বৃত্তি পেয়েছে। এখানে ঈশ্বর পড়েছে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ত্ব। হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "(হরনাথ) তর্কভূষণ মহাশয়, দর্শনশাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার তৎপূর্ব্বে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না ; সুতরাং ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম ছিলেন। যদিও অগ্রজ (ঈশ্বরচন্দ্র) স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না, একারণ, অদ্বিতীয় ধীশক্তিসম্পন্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট যাইয়া স্মৃতি অধ্যয়ন করিতেন।" ১৮৩৮-৩৯ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়ে ঈশ্বর নগদ আশি টাকা পুরস্কার পেয়েছে।

উঁচুশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে-মধ্যে সংস্কৃত গদ্য-পদ্য রচনা লিখতে হত। সংস্কৃত রচনা লিখতে সাহস হত না ঈশ্বরের। সংস্কৃত রচনার

সময় এলেই ঈশ্বর পালিয়ে যেত।

১৮৩৮ সালে সংস্কৃত কলেজে নিয়ম হয়ে গেল স্মৃতি, ন্যায় আর বেদান্তশ্রেণীর ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার সময় গদ্যে-পদ্যে সংস্কৃত রচনা লিখতে হবে। গদ্য যার সবচেয়ে ভালো হবে, সে একশো টাকা পুরস্কার পাবে। পদ্য যার সবচেয়ে ভালো হবে, সে-ও একশো টাকা পুরস্কার পাবে।

গদ্য-পদ্যের পরীক্ষা একই দিনে হবে। দশটা থেকে একটা পর্যন্ত গদ্যরচনার পরীক্ষা। একটা থেকে চারটে পর্যন্ত পদ্যরচনার পরীক্ষা।

সেবার গদ্য-পদ্য পরীক্ষার দিন সব ছাত্র ঠিক সময়ে এসেছে, দশটার সময় লিখতে আরম্ভ করেছে। সকলেই তো এসেছে, কিন্তু ঈশ্বর কই? ঈশ্বর গদ্য-পদ্য পরীক্ষা দিতে বসেনি কেন?

অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ খুব ভালোবাসেন ঈশ্বরকে। তিনি জোর করে ঈশ্বরকে ধরে নিয়ে গেলেন। পরীক্ষার জায়গায় বসিয়ে দিলেন।

ঈশ্বর বলল—আপনি জানেন, সংস্কৃত রচনা লিখতে আমার কোনোমতে সাহস হয় না। কেন আপনি আমাকে এখানে এনে বসালেন?

প্রেমচন্দ্র বললেন—যা পারো, কিছু লেখো। নইলে সাহেব খুব অসন্তুষ্ট হবেন।

সাহেব মানে মার্শাল সাহেব। তিনিই তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি।

ঈশ্বর বলল—আর-সকলে দশটার সময় লিখতে আরম্ভ করেছে। এখন এগারোটা বেজেছে। এই অল্প সময়ে আমি কত লিখতে পারব?

প্রেমচন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন—যা ইচ্ছা করো।

বলে চলে গেলেন।

'সত্য কথনের মহিমা' সম্পর্কে সংস্কৃতে গদ্যরচনা লিখতে হবে। বারোটা পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল ঈশ্বর, কিছুই লিখতে পারল না।

ঈশ্বর কী করছে, কে জানে। প্রেমচন্দ্র একবার খোঁজ নিতে

এলেন। এসে দেখলেন, কিছুই লেখেনি, ঈশ্বর চুপচাপ শুকনো মুখে বসে আছে। প্রেমচন্দ্র রাগ করলেন।

ঈশ্বর বলল—কী লিখব, কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

প্রেমচন্দ্র বললেন—'সত্যং হি নাম' এই বলে আরম্ভ করো।

আরম্ভ করে দিল ঈশ্বর। 'সত্যং হি নাম' লিখে আরম্ভ করল। অনেক কষ্টে অনেক ভেবেচিন্তে একঘণ্টায় মাত্র কয়েকটি লাইন লিখতে পারল। একটার সময় নাম সই করে কাগজ দাখিল করে দিল।

ঈশ্বরের সেই রচনাটি তুলে দিচ্ছি : "সত্যং হি নাম মানবস্য সাধারণজনবিশ্বসনীয়তাপ্রতিপাদকং বিশ্বসনীয়তায়াশ্চ ফলমিহ বহুতরমুপলভ্যতে তথাহি যদি কস্যচিৎ কথঞ্চন সত্যকথনদর্শনেন সাধারণসমীপে বিশ্বসনীয়তা ভবতি ভবতি হি তস্য ক্রমশো নরপতিবিশ্বাসভাজনতা সমুদ্ভূতায়াঞ্চ তস্যাং কিং নাম নরস্য দুরবাপমবতিষ্ঠতে অর্থিপ্রত্যর্থিনোশ্চ বিবদমানয়োঃ সন্দিগ্ধবিষয়ে সন্দেহাপারপারাবারবারিণি নিমগ্নস্য নরপর্তেন তন্নিস্তরণবিষয়ে সাক্ষিণাং সত্যবচনতরণিরূপাবলম্বনমন্তরেণ কশ্চন সদুপায়ঃ সাক্ষিণামপি সত্যকথনেন বহুতরপ্রতিষ্ঠা দৃশ্যতে যস্য পুনর্বচসি ন সত্যতাপ্রতিভাসঃ কো নাম তমিহ বিশ্বসিতি তথাপি যদি কথঞ্চন সাক্ষিণাং বচনস্যাসত্যতাবিজ্ঞানং ভবতি তে খলু ভবন্তি চিরমেব সাক্ষিধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ সততাবিশ্বসনীয়া অনেকশো দণ্ডনীয়াশ্চ অপিচ কিমত্র বহুতরং বক্তব্যং শিশবোঽপি বাললীলাবিষয়ে যদি কশ্চিন্মিথ্যাবাদিতয়া নিশ্চিতো ভবতি শৃণুত ভোঃ সখায়ো নানেনাধমেনাস্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্তব্যময়ং খলু মৃষাভাষীত্যেবমাদি গিরমুদ্গিরন্তীতি লৌকিককার্য্যে বহুধা সত্যকথনস্যোপকার ইত্যস্তু কিং বিস্তেরেণেতি। ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ ।।"

পুরস্কার তো দূরের কথা, ঈশ্বর মনে মনে ভাবল, রচনার নমুনা দেখে পরীক্ষকেরা নির্ঘাত হাসি-ঠাট্টা করবেন।

কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা সত্য হল না। গদ্যরচনার জন্য সেবার ঈশ্বরই পুরস্কার পেল।

প্রেমচন্দ্র ঈশ্বরকে বললেন—দ্যাখো, তুমি কিছুতেই রচনার পরীক্ষা দিতে রাজী হওনি। পীড়াপীড়ি করে আমি তোমাকে পরীক্ষা দিতে বসিয়েছিলাম, তাতেই তুমি একশো টাকা পুরস্কার পেলে। তোমার রচনা দেখে সকলে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সংস্কৃত রচনায় আর তুমি বিমুখ হয়ো না।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "ইহার অব্যবহিত পরে পিতৃদেব মধ্যমাগ্রজের বিবাহবিধি সমাধা করেন; এতদুপলক্ষে পিতৃদেবের বিলক্ষণ ঋণ হইয়াছিল। বীরসিংহস্থ ভবনের কিছুমাত্র ব্যয়ের লাঘব করিতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা কলিকাতাস্থ বাসার ব্যয়ের হ্রাস করেন। দুগ্ধ, মৎস্যাদি কিছু কালের জন্য রহিত হয়। বৈকালে জল খাবার জন্য আধ পয়সার ছোলা আনিয়া ভিজান হইত, আধ পয়সা বাতাসা আসিত, ইহাই বৈকালে সকলের জলখাবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ আর্দ্র ছোলার কিয়দংশ রাত্রে কুমড়ার ব্যঞ্জনের সহিত পাক হইত। ঐ সময় কষ্টের পরিসীমা ছিল না।"

এদিকে জগদ্দুর্লভ সিংহ পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ে গেলেন। জগদ্দুর্লভের বাড়িতে তেতলার ঘরে থাকত ঈশ্বরেরা। ভাড়া দিতে হত না। সে-বাসা কিছুকালের জন্য ছেড়ে দিতে হল। কিছুকাল ঈশ্বরেরা কাটাল গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পিসেমশায়ের বাসায়। তারপর আবার এল জগদ্দুর্লভের বাড়িতে। জগদ্দুর্লভ আর্থিক অসুবিধায় আছেন তখন, তেতলার ওই ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন তনসুকদাস নামে একজন হিন্দুস্থানীকে। অগত্যা ঈশ্বরেরা বাসা করল জগদ্দুর্লভের বাড়ির নিচতলার ঘরে। খুব স্যাঁতসেঁতে ঘর। যা হোক, গদ্য লিখে পুরস্কার পেয়ে সংস্কৃত রচনায় সাহস আর উৎসাহ পেল ঈশ্বর। পরের দু'বার সংস্কৃতে পদ্য লিখে সংস্কৃত কলেজ থেকে পুরস্কার পেল।

সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মাঝে-মাঝে উঁচুশ্রেণীর ছাত্রদের পদ্য লিখতে বলতেন। অনেকেই লেখে, কিন্তু ঈশ্বর কখনো লেখে না।

সংস্কৃতে রচনা লিখে ঈশ্বর পুরস্কার পাবার পর জয়গোপাল

একদিন তাকে বললেন—আর আমি তোমার ওজর শুনব না। আজ তোমাকে পদ্য লিখতে হবে।

জয়গোপাল কয়েকজন ছাত্রকে পদ্য লিখতে বললেন। একঘণ্টার মধ্যে পদ্য লিখতে হবে। পদ্যের চতুর্থ চরণে 'গোপালায় নমোঽস্তু মে' থাকা চাই।

গোপালায় নমোঽস্তু মে? একটু রঙ্গ করার ইচ্ছা হল ঈশ্বরের। সে জয়গোপালকে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোন গোপালের বর্ণনা করব? এক গোপাল আমাদের সামনে আছেন। আরেক গোপাল বহুকাল আগে বৃন্দাবনে লীলা করে অন্তর্হিত হয়েছেন। এই দু-জনের মধ্যে কোন গোপালের বর্ণনা আপনি চান, স্পষ্ট করে বলুন।

ঈশ্বরের রঙ্গ শুনে জয়গোপাল না হেসে পারলেন না। বললেন—বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা করো।

একঘণ্টায় পাঁচটি শ্লোক লিখল ঈশ্বর ঃ

"যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥১॥
ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেনুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥২॥
ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥৩॥
বৃষ্ণিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥৪॥
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥৫॥"

প্রত্যেক বছর বাড়িতে ঘটা করে সরস্বতী পূজা করতেন জয়গোপাল। অনেক ছাত্রকে নেমন্তন্ন করতেন। পূজার দিন ছাত্রেরা জয়গোপালের বাড়িতে দু-বেলা দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করত, বিকেলে আর রাত্রে গান শুনত। সরস্বতী পূজার দিন ওদের আমোদের আর অন্ত নেই।

সরস্বতী পূজার আগের দিন জয়গোপাল উঁচুশ্রেণীর ছাত্রদের পদ্যে সরস্বতীর বর্ণনা করতে বলতেন। ঈশ্বর কখনো সে-বর্ণনা লিখতে রাজী হত না। মাত্র একবার ঈশ্বর এড়াতে পারেনি জয়গোপালকে। তাঁর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ঈশ্বর মাত্র একবার একটি শ্লোকে সরস্বতীর বর্ণনা করেছে, সরস্বতীর নামে একটি সরস শ্লোক লিখেছে। শ্লোক দেখে খুব খুশি হয়েছেন জয়গোপাল। অনেককে ডেকে এনে জয়গোপাল নিজে ঈশ্বরের শ্লোক পড়ে শুনিয়েছেন।

ভারি মজার শ্লোকটি ঃ

"লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্।"

শ্লোক নিয়ে আরেকটি বলবার মতো ঘটনা আছে।

জন মিয়র নামে একজন সাহেব, ১৮৩৮ সালের ৮ ফেব্রুআরি, সাহারাণপুর থেকে সাদারল্যাণ্ড সাহেবকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন ঃ

"I shall be glad to offer a prize of Rs. 50 to the students of the Sanskrit College Calcutta for the best essay on the evidences of Design and of the power, wisdom and goodness of God as displayed in the creation in Sanskrit verse, and of such a length as may be thought best, perhaps 50 to 100 Slokas......"

১৮৩৮ সালের একদিন। কলেজের সেক্রেটারি সব ছাত্রকে বললেন—জন মিয়র নামে একজন সাহেব লিখেছেন, পরমেশ্বরের মহিমা সম্পর্কে যে-ছাত্র সকলের চেয়ে ভালো একশোটি শ্লোক লিখতে পারবে, তাকে তিনি কিছু নগদ টাকা পুরস্কার দেবেন।

প্রায় সব ছাত্র পরে আলাপ-আলোচনা করে সাব্যস্ত করল, পুরস্কারের টাকা পাওয়া যাবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে, অতএব পরিশ্রম করে শ্লোক লেখার দরকার নেই।

কিন্তু দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় নামে একটি ছাত্র বলল—টাকা পাই আর না পাই আমি ওই একশোটি শ্লোক লিখব।

লিখল। এবং নগদ টাকা পুরস্কার পেল।

কিছুদিন পরে আবার আরেক খবর এল। মিয়র সাহেব আবার পুরস্কার দেবেন, নগদ টাকাই পুরস্কার দেবেন। তবে এবার আর পরমেশ্বরের মহিমা নিয়ে নয়, পদার্থবিদ্যা নিয়ে। পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যার একশো শ্লোক সবচেয়ে ভালো হবে, সেই ছাত্র পুরস্কার পাবে।

এবার অনেক ছাত্রই সাব্যস্ত করল, লিখবে। সত্যি-সত্যি পুরস্কারের টাকা পাওয়া যাচ্ছে।

পাঁচসাত দিন পরের কথা। একই শ্রেণীর একটি ছেলে এসে ঈশ্বরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—তুমি কি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে শ্লোক লিখবে?

ঈশ্বর বলল—আমার ইচ্ছা নেই। কিন্তু অধ্যাপক মশায়েরা বড়ো পীড়াপীড়ি করছেন, যদি তাঁদের এড়াতে না পারি, অগত্যা লিখতে হবে!

—দ্যাখো, এবার অনেকেই শ্লোক লিখবে। কিন্তু, যদি আমরা দুজনে মিলে লিখি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পুরস্কার পাব। এসো আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে শ্লোক লিখি, তুমি পঞ্চাশটি লেখো, আমি পঞ্চাশটি লিখি। তারপর, হয় তোমার নামে, না হয় আমার নামে, একশোটি শ্লোক কর্তৃপক্ষের হাতে দেব। পুরস্কার পেলে দুজনে সমান ভাগ করে নেব।

গোড়ায় ঈশ্বর এ-কথায় রাজী হয়নি। ছেলেটির অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজী হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের হাতে সব শ্লোক যেদিন দেবার কথা তার দশ-বারো দিন আগে ওই ছেলেটি ঈশ্বরকে বলল—দ্যাখো, নানা কারণে আমার ভাগের পঞ্চাশটি শ্লোক লেখা হল না। তুমিই পুরোপুরি একশোটি শ্লোক লিখে দাও।

ঈশ্বর বলল—দ্যাখো, আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কেবল

তোমার পীড়াপীড়িতেই এ-কাজ করেছি। তুমি যখন করলে না, আমিও করব না। তাছাড়া, সব যোগাড় করে আরো পঞ্চাশটি শ্লোক লেখার আর সময় নেই। এই অবস্থায় এ-বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভালো।

বলে ওই ছেলেটির সামনেই নিজের লেখা শ্লোকগুলো ঈশ্বর ছিঁড়ে ফেলে দিল।

কর্তৃপক্ষের হাতে সব শ্লোক যেদিন দেবার কথা, আশ্চর্য কাণ্ড, ওই ছেলেটিও সেদিন নিজের লেখা একশোটি শ্লোক দাখিল করল। দেখে অবাক হয়ে গেল ঈশ্বর। এই ঘটনার আগে ঈশ্বর কখনো ধারণা করতে পারেনি যে কেউ কারো সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত চাতুরী করতে পারে।

কিছুদিন পরে আবার আরেক পুরস্কারের পালা। ওই মিয়র সাহেবই পুরস্কার দেবেন, নগদ টাকাই পুরস্কার দেবেন। এবার শ্লোক লিখতে হবে ভূগোল-খগোল বিষয়ে।

সেবার পুরস্কার পেল ঈশ্বর। ওই চতুর ছেলেটির পক্ষে দুঃসংবাদ নিশ্চয়ই।

এই পুরস্কার পেল যখন, ঈশ্বর তখন ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র।

আট

অন্যরকম একটি ঘটনার বিবরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন :

"ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি তিন সহোদর ও তাহাদিগের জনক ঠাকুর-দাস যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীতে বিসূচিকা (কলেরা) রোগ অতি প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হইল। প্রত্যহ অনেক ব্যক্তি যমসদনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ পীড়াকে অতি মারাত্মক এখনকার প্লেগ রোগের ন্যায় বিশেষ সংস্পর্শাক্রান্ত রোগ মনে করিত। এখনও যে মনে করে না তাহা নহে।

ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্লভ সিংহের কোন পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কহিল আপনার পরিচিত অমুক সপরিবারে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সে একান্ত দরিদ্র। কেহ তাহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইবে এমন উপায় দেখি না। ঈশ্বরচন্দ্র তথায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি শুনিয়া কাহাকেও কিছু কহিলেন না। আন্তরিক বড়ই ব্যথা পাইলেন। সন্ধ্যার পরেই পাক সমাধা করিয়া দীনবন্ধু ও শম্ভুকে আহার করাইয়া পিতার ভোজনের আয়োজন করিয়া সেই পীড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারা পাঁচ জনেই শয্যাশায়ী হইয়াছে জল পিপাসায় অত্যন্ত কাতর। মধ্যে মধ্যে তাহারা বমি ও মলত্যাগ করিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক গৃহস্থের বাটী হইতে এক কলসী জল আনিলেন এবং চক্‌মকী ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। তিনি সকলকে জল পান করাইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা হরচন্দ্র ওলাউঠা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তদবধি তাহার মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে,

যদি কেহ ওলাউঠা রোগীর পিপাসা দূর করিতে পারে, তাহা হইলে শতকরা বার আনা লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে।* একদিন একটা নিমন্ত্রণ সভায় ডাক্তার রূপচাঁদবাবুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে ওলাউঠা রোগে রোগীকে যত জল খাওয়াইতে পারিবে ততই তাহার উপকার হইবে।…

ঈশ্বরচন্দ্র রূপচাঁদবাবুর অন্বেষণে যাইতেছেন সৌভাগ্যক্রমে তাহার সহিত পথিমধ্যে দেখা হইল। ঈশ্বরচন্দ্র রোগীদিগের অবস্থা সমুদায় যথাযথ রূপচাঁদবাবুকে কহিলেন। রূপচাঁদবাবু বলিলেন চল পুলীষে একবার জানাই। গবর্নমেণ্ট হইতে যদি অনাথ ব্যক্তিবর্গের যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও নবাব নেজামত হইতে দুঃখী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য পুলীষের হাতে টাকা ও ঔষধ আছে। উভয়ে বড় বাজারের পুলীষের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুলীষ সাহেবকে সংবাদ দিবা মাত্র তিনি কতকগুলি ঔষধের পীল দিলেন। এবং কহিলেন খুব সাবধান যেন জল অনেক না খায়। জল না খাইলে ভাল হয়। রূপচাঁদ কহিলেন সাহেব আপনার উপদেশানুসারেই চলিব। কিন্তু এখন তাহাদিগের মলমূত্র পরিষ্কারের জন্য একটা লোক আবশ্যক। সাহেবও অতি দয়ালু ও উচ্চ বংশের লোক ছিলেন। তিনি একটী মেথরাণীকে সরকার হইতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং পথ্যের খরচ যাহা লাগিবে তাহার জন্য সর্কারে বিল করিতে বলিলেন। রূপচাঁদ কহিলেন কে অগ্রে খরচ দিবে যে পরে বিলের টাকা আদায় হইলে সে উহা পরিশোধ করিয়া লইবে। সাহেব কহিলেন আমি নিজ হইতে দুইটি টাকা দিলাম। ইহা আমার নিজের দান জানিবেন। এখন রূপচাঁদ ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া রোগীদিগের নিকট আসিলেন। রোগীদিগকে দেখিয়াই কহিলেন বড় মন্দ অবস্থা। পুলীষের পীল খাওয়াইয়া উহাদিগকে অনর্থ কষ্ট দিও না কেবল জল খাওয়াও। যদি উপকার হয় ইহাতেই হইবে। মেথরাণী দ্বারা মল ও বমি পরিষ্কার করাইয়া

* এখানে লালমোহন বিদ্যানিধি ঈষৎ ভুল করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় তার ভাই হরচন্দ্রের মৃত্যু হয়নি।

লও। আমি বাটী হইতে পুরাতন ধৌত কাপড় পাঠাইয়া দিতেছি। তাহা জলে ভিজাইয়া উহাদিগের গাত্র মার্জনা করিবে। রূপচাঁদ ডাক্তার বাটী যাইয়া দুইটি বেদানা কিঞ্চিৎ মিছরি ও এক কলসী উত্তম পানীয় জল ও ধৌত বস্ত্রখণ্ড পাঠাইয়া দিলেন।

মেথরাণী বিষ্ঠা ও বমনের অপবিত্রতা মাত্র দূরীভূত করিয়া প্রস্থান করিল। ঈশ্বর এখন একাকী রোগীদিগকে রূপচাঁদবাবুর উপদেশানুসারে পিপাসার জল যোগাইতেছেন। ক্রমে শিশুদ্বয় কথা কহিল। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের মনে শ্রম সার্থক বোধ হইতে লাগিল। এই সময় তাহার মনে মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন উদিত হইল।

জলেন পাচয়েদন্নং জলে জীবঞ্চ দৃশ্যতে।

এবং অগ্নি পুরাণের চিকিৎসা প্রকরণের যথা শ্রুত বচনও তাহার চিত্ত ক্ষেত্রে উদিত হইল!

অজীর্ণে ভেষজং বারি জীর্ণে বারি বল প্রদং।

এইরূপে রাত্রি অবসানকালে স্ত্রীলোকটি কহিল বাবা তুমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছ। একবার বাবুদিগের বৈঠকখানায় শয়ন কর। বাবুরা অতি ভদ্রলোক। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝিলেন ইহারও উপকার হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী ভাবিল এমন দয়াময় বালক যদি না ঘুমাইয়া পীড়িত হয় তবে তাহাদিগকে আর কে দেখিবে। ঈশ্বরচন্দ্র দিবার প্রথম ভাগ তাহাদিগের নিকট অতিবাহন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মিছিরি ও বেদানা পথ্য দিয়া বাসায় প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান সময়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান সমাধা করিয়া না গেলে বাসার লোক ও গৃহস্থ জগদ্দুর্লভবাবু যদি শুনেন যে ওলাউঠা রোগীর সেবায় নিযুক্ত ছিল সংস্পর্শাক্রান্ত রোগ—অনায়াসে বাসায় প্রবিষ্ট হইবে বিশেষতঃ রাত্রি জাগরণের পর স্নান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় সেইজন্য বড়বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাইলেন। তথায় রূপচাঁদ-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন রোগীরা কিরূপ আছে। ঈশ্বর কহিলেন সমস্তই মঙ্গল। রূপচাঁদ কহিলেন তোমাকে আর দুই দিন ভুগিতে হইবে। ঈশ্বর কহিলেন তাহাও কি আপনাকে কহিতে হইবে। উহা আমার নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছি।

রূপচাঁদ কহিলেন আমার কর্ত্তব্যও আমি করিব।

ঈশ্বরচন্দ্র স্নানান্তে বাসায় আসিলে দীনবন্ধু কহিলেন দাদা কালি আপনি রাত্রিতে গিয়াছেন এখন কত বেলা হইয়াছে দেখুন দেখি। আমাদিগের আহারাদি কিছুই হয় নাই। বাবা আপনাকে মধুসূদন ঠাকুরদাদার বাসায় অনুসন্ধানে গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র কোন কথা না বলিয়া পাক আরম্ভ করিলেন। এমন সময় ঠাকুরদাস উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কালি রাত্রিতে কোথা ছিলি কাহাকেও কিছু বলিস নাই। আমি বেলা হইল দেখিয়া মধুসূদনের বাসায় অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। সে কহিল কালি তুমি তাহার সঙ্গে দেখাও কর নাই। সে আরও বলিল এ অঞ্চলে ওলাউঠার পীড়া প্রবলভাবে বিস্তৃত হইতেছে হয়ত কোন সতীর্থের পীড়ার সংবাদ পাইয়াছে তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য তথায় গিয়াছে। ঈশ্বরের অন্তঃকরণ অত্যন্ত মায়ায় আচ্ছন্ন পরোপকার করিতে পারিলে তাহার আহ্লাদের সীমা থাকে না। এই কথা শুনিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। ব্যাপারখানা কি বল দেখি শুনি।

ঈশ্বরচন্দ্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। ঠাকুরদাসও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত আর কিছু কহিলেন না। পূর্ব্ববৎ সকলের আহারাদি সমাধা হইয়া গেল। ঠাকুরদাস অফিস যাত্রা করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধুকে কহিলেন কলেজে যাইয়া আমাদিগের শ্রেণীর অধ্যাপককে কহিবি দাদা আজি এক স্থানে পীড়ার সংবাদ পাইয়াছেন তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য তিনি তথায় উপস্থিত থাকিবেন। তাহারা অতি দরিদ্র সুতরাং দাদা শুনিয়া থাকিতে পারিলেন না। দীনবন্ধুকে এই কথা বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্থান করিলেন!···

ঈশ্বরচন্দ্র রোগীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রূপচাঁদ ডাক্তার সভৃত্য তথায় উপস্থিত আছেন। রূপচাঁদ ঈশ্বরচন্দ্রকে কহিলেন তোমার সেবায় সকলেই জীবন পাইল এবং আমার জলচিকিৎসায় অব্যর্থ ফল দেখাইতে পারিলাম। তোমার মত প্রকৃত সুবুদ্ধি কর্ম্মঠ এবং পরোপকারী ব্যক্তিকে না পাইলে আমার জলচিকিৎসার অব্যর্থ ফল দেখাইতে পারিতাম না। আজি

হইতে তোমার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।"

১৮৩৯ সালের জুন মাসে ঈশ্বর ন্যায়শ্রেণীতে এসেছে। এই শ্রেণীর অধ্যাপক তখন নিমাইচন্দ্র শিরোমণি। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "সে সময়ে তিনি (নিমাইচন্দ্র শিরোমণি) বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে সকল দর্শনবেত্তাদিগকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।" নিমাইচন্দ্রের বাড়ি কাঁচড়াপাড়ায়; সংস্কৃত কলেজের আরম্ভ থেকেই তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক। নিমাইচন্দ্র অসামান্য নৈয়ায়িক; তিনি 'ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ'। নিমাইচন্দ্র সম্পাদিত দু-খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে: ন্যায়সূত্রবৃত্তি; মহাভারত (এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল সংস্কৃত মহাভারতের একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেছে; সেই মহাভারতের অন্তত তিনটি খণ্ডের একজন সম্পাদক নিমাইচন্দ্র শিরোমণি)।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত লিখেছেন: "8 of the students out of 9 having entered it (Nyaya or Logic class) in May, 1840. One student only, Ishwarchundar, entered the class in June, 1893........

, The names of the students, who distinguished themselves are Ist Ishwarchundar, 2d Greeshchundar, 3d Rajcrishna and 4th Madhusudana.

I would beg to recommend, that the same number of prizes and of similar amounts, as last year be awarded in this, Ist 100 Rupees to Ishwarchundar, and 2nd 50 to Greeshchundar."

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে ঈশ্বর পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে সবচেয়ে ভালো ফলের জন্য একশো টাকা এবং সংস্কৃত পদ্য লিখে একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছে। বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে সংস্কৃতে একটা পদ্য লিখে ঈশ্বর একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছে বটে।

তিন ঘণ্টায় ঈশ্বর বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে আটটি শ্লোক লিখেছে:

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং
চিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি।

সত্যামৃতং বচসি সিঞ্চতি কিঞ্চ বিদ্যা
বিদ্যা নৃণাং সুরতরুর্ধরণীতলস্থঃ ॥ ১ ॥
বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্য্যং
বিদ্যা বিদেশগমনে সুহৃদদ্বিতীয়ঃ।
বিদ্যা হি রূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং
বিদ্যা ধনং ন নিধনং ন চ তস্য ভাগঃ ॥ ২ ॥
রূপং নৃণাং কতিচিদেব দিনানি নূনং
দেহং বিভূষয়তি ভূষণসন্নিকর্ষাৎ।
বিদ্যাভিধং পুনরিদং সহকারিশূন্যম্
আমৃত্যু ভূষয়তি তুল্যতয়ৈব দেহম্ ॥ ৩ ॥
অন্যানি যানি বিদিতানি ধনানি লোকে
দানেন যান্তি নিধনং নিয়তং নু তানি।
বিদ্যাধনস্য পুনরস্য মহান্ গুণোঽসৌ
দানেন বৃদ্ধিমধিগচ্ছতি যৎ সদেদম্ ॥ ৪ ॥
নৈশ্বর্য্যেণ ন রূপেণ ন বলেনাপি তাদৃশী।
যাদৃশী হি ভবেৎ খ্যাতির্বিদ্যয়া নিরবদ্যয়া ॥ ৫ ॥
দুর্বলোঽপি দরিদ্রোঽপি নীচবংশভবোঽপি সন্।
ভাজনং রাজপূজায়া নরো ভবতি বিদ্যায়া ॥ ৬ ॥
বিদ্বৎসভাসু মনুজঃ পরিহীণবিদ্যো
নৈবাদরং ক্বচিদুপৈতি ন চাপি শোভাম্।
হাসায় কেবলমসৌ নিয়তং জনানাং
তজ্জীবিতং বিফলমেব তথাবিধস্য ॥ ৭ ॥
অজ্ঞানখণ্ডনকরী ধনমানহেতুঃ
সৌখ্যাপবর্গফলমার্গনিদেশিনী চ।
সা নঃ সমস্তজগতামভিলাষভূমির-
বিদ্যা নিরস্য জড়তাং ধিয়মাদধাতু ॥ ৮ ॥"

সেসময়ে বীরসিংহে গেলে ঈশ্বরের সঙ্গে অনেকের শাস্ত্রবিচার হয়েছে। বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে সকলেই ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করেছেন।

বীরসিংহের কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ করছেন। সেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্রে সংস্কৃত কবিতা লিখে দিয়েছে ঈশ্বর। শ্রাদ্ধের দিন নানা জায়গা থেকে পণ্ডিতেরা এসেছেন। জানতে চেয়েছেন ঃ ওই সংস্কৃত কবিতা কার লেখা ?

ঈশ্বরের লেখা। তারপর সকল পণ্ডিত শাস্ত্রবিচার করেছেন ঈশ্বরের সঙ্গে এবং পরাস্ত হয়েছেন। কুরাণগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন তর্কসিদ্ধান্ত বিচারে পরাস্ত হয়েছেন শুনে ঠাকুরদাস রামমোহনের বিস্তর স্তবস্তুতি করলেন, রামমোহনের পায়ের ধুলো নিয়ে ঈশ্বরের মাথায় দিলেন। রামমোহন ঠাকুরদাসকে বললেন— তোমার পুত্র ঈশ্বর যেমন কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র শিখেছে বাঙলাদেশে তেমন আর কেউ পারে না। ভবিষ্যতেও যে পারবে, এমন আশা করা যায় না। ঈশ্বরের প্রতি সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি হয়েছে, না হলে এই অল্পবয়সে এত শাস্ত্র কেমন করে শিখল।

সেকালে যাঁরা আদালতে জজপণ্ডিত হতেন, তাঁদের হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় পাশ করতে হত। 'জজপণ্ডিত' কাকে বলে ? বিহারীলাল সরকার লিখেছেন ঃ "পূর্ব্বে প্রত্যেক জিলায় যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবার জন্য একজন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সচরাচর আদালতের জজ-পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইতেন।"

১৮৩৯ সালের ২২-এপ্রিল ঈশ্বর হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিল। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন ঃ "সাধারণ পণ্ডিতগণ ২।৩ বৎসরে যে সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতেন ; তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) স্মৃতির সেই সকল গ্রন্থ ছয় মাসে মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে পিতৃদেবকে বলিলেন, আমি ছয় মাস পাকাদিকার্য সম্পাদন করিতে পারিব না। সুতরাং তাঁহার অনুজ দীনবন্ধুকে দুইবেলা পাকাদিকার্য সমাধা করিতে হইত। তখন মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধুর বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রাতঃকাল হইতে সমগ্র মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ বেলা নয় ঘটিকা পর্যান্ত অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া আবৃত্তি করিতেন এবং ভোজনান্তে বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গাস্থ বিদ্যালয় যাইবার সময়

পথে আবৃত্তি করিতে করিতে গমন করিতেন। কলেজে উপস্থিত হইয়া পড়া বন্ধ করিতেন। পুনরায় ৪টার পর বাসা আসিবার সময় পথে আবৃত্তি করিতে করিতে বাসায় আসিতেন। রাত্রি দশটার সময় ভোজন করিয়া দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। নিকটস্থ আরমানি গিরজার ঘড়িতে রাত্রি বারটা বাজিলে পুনর্ব্বার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সমস্ত রাত্রি স্মৃতি আবৃত্তি করিতেন।"

সেদিন (২২-এপ্রিল, ১৮৩৯) এগারোজন ছাত্র হিন্দু-ল-কমিটির পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করেছে মাত্র তিনজন, তিনজনের মধ্যে একজন ঈশ্বর। সাদারল্যাণ্ড সাহেবের লেখা, ১৮৩৯ সালের ১৬-মের, একখানা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ্রাম : বীরসিংহ ; জিলা : হুগলী ; বর্তমান নিবাস : বড়বাজার) হিন্দু-ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং হিন্দু-ল-কমিটি থেকে যথারীতি একখানা সার্টিফিকেট পেয়েছে :

"HINDOO LAW COMMITTEE OF EXAMINATION

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the Twenty-second April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation X1 1926 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Court of Judicature.

H. T. PRINSEP President

J. W. J. OUSELY Members of the Committee of Examination.

This certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the Seal of the Committee this Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the Third Joistha 1761 Shukavda.

J. C. C. Sutherland
Secy. to the Committee." *

---

* এই প্রশংসাপত্র সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে "বিদ্যাসাগর" উপাধিটি লক্ষণীয়। অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজে পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিয়াছিলেন। এরূপ উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা জানা যাইতেছে।"

এই সার্টিফিকেট পাওয়ার কিছুকাল পরে ত্রিপুরায় জজ-পণ্ডিতের একটা চাকরি খালি হওয়ার খবর পাওয়া গেল। সেই চাকরির জন্য ঈশ্বর দরখাস্ত করল। চাকরিটা পাওয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরদাস অমত করলেন বলে ঈশ্বরের আর ওই চাকরি করা হল না।

বিশেষ কোনো সখ নেই ঈশ্বরের? আছে। কবিগানের খুব সখ আছে। কোথাও কবিগান হলে ঈশ্বর শুনতে যায়। বীরসিংহে গেলে সমবয়সী ভাইবন্ধু নিয়ে কবিগান করে।

ঈশ্বরের খেলাধুলো নিয়েও দু-কথা বলা দরকার। ছুটিতে বীরসিংহে গেলে গ্রামের গদাধর পাল, ব্রজমোহন চক্রবর্তী ও ছোটো ভাইদের নিয়ে ঈশ্বর কপাটি খেলে।

কখনো-কখনো মদনমোহন মণ্ডলের সঙ্গে লাঠি খেলে। কাস্তে নিয়ে মাঠে ধান কাটে, মাঠ থেকে মজুরদের সঙ্গে ধান বয়ে আনে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "(ঈশ্বরচন্দ্র) বাল্যকালে দেশে যাইয়া কৃষকগণের সহিত মাঠে কাস্তিয়া লইয়া ধান্য কাটিতেন। ভ্রাতৃগণকে বলিতেন, সকলে মাঠে চল, মাঠ হইতে ধান বহিয়া আনিতে হইবে। মজুরদের সহিত ধান বহিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেন।"

আগেই বলা হয়েছে, ১৮৩৫ সালের নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃত কলেজের সকল বিভাগের বহু ছাত্র আবার ইংরেজী শ্রেণী খোলার জন্য ১৮৩৯ সালের ২১-মে সেক্রেটারি জি. টি. মার্শালের কাছে একখানা আবেদনপত্র দাখিল করল। ঈশ্বরের স্বাক্ষর আছে সেই আবেদনপত্রে। আবেদনপত্র থেকে তুলে দিচ্ছি: "...আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজিভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্তভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাঁহার যে কেবল এতন্মহানগরস্থ প্রধান

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্তভাষাভ্যাস বিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারি— লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্যাষ্টদিবসীয়া—"

কিন্তু এই আবেদন বিফল হয়েছে। ঈশ্বর যতদিন সংস্কৃত কলেজে ছাত্র ছিল ততদিন পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে আর ইংরেজী শ্রেণী খোলা হয়নি। সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বর আর ইংরেজী পড়ার সুযোগ পায়নি। এখানে বলে রাখা ভালো, ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া সাঙ্গ করে চলে যাবার পর ১৮৪২ সালের অক্টোবরে সংস্কৃত কলেজে আবার ইংরেজী শ্রেণী খোলা হয়েছে।

নয়

১৮৪০ সালের ১২-ফেব্রুআরি নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হল। তখন কিছুদিন সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ন্যায়শাস্ত্র পড়ালেন। সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ প্রত্যহ কলেজে এসে চেয়ারে বসে ঘুমোতেন, অনবরত নস্য নিতেন, কিন্তু না ঘুমিয়ে থাকতে পারতেন না; ছাত্রেরা এককালে সর্বানন্দ নামে কবিতা রচনা করেছে: "সর্ব্বানন্দ-ন্যায়বাগীশো ভায়া নিত্যং নিদ্রাং যাতি কলেজমধ্যে। ধীরো নান্নাধ্যাপনা নাস্তি তস্য চত্বারিংশন্মুদ্রিকাণাং গতেহপি।" সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ সংস্কৃত কলেজে নানা শ্রেণীতে অস্থায়ীভাবে অধ্যাপনা করেছেন; ১৮৪৬ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রস্থান করেছেন।

তারপর জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কথায় চলে আসা দরকার।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন অসামান্য পণ্ডিত। ১৮৭২ সালের ২৬-নভেম্বর স্থলভ সমাচার' লিখেছে: "আমাদের দেশের নৈয়ায়িকেরা সচরাচর কাজ চালানমত দুই একখান গ্রন্থ পড়িয়া, দুই চারটা ফাঁকি শিখিয়া কেবল টিকি নাড়িয়া "অবচ্ছেদাবচ্ছেদক" করিয়া বেড়ান। কিন্তু (জয়নারায়ণ) তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ন্যায়শাস্ত্রে প্রকৃত গভীর বিদ্যা ছিল। তাঁহার নিকট যাঁহারা পড়িতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার গভীর বিদ্যা ও পরিষ্কার বিচারশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। অধিক সুখের বিষয় এই যে, এত বিদ্যা থাকিয়াও তাঁহার লোক দেখান ছিল না; বৃথা আস্ফালন তিনি কখন করিতেন না। কোন প্রশ্ন হইলে অতি ধীর, প্রশান্ত ও গভীরভাবে ফল কথাগুলি বলিয়া দিতেন। তিনি দুই পক্ষের মধ্যস্থতা করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার

। ছাড়িয়া আগড়ম বাগড়ম বকা কাহারও সাধ্য হইত না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃত পথে আনিয়া দিতেন। ন্যায়ে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্য সকল বিষয়েও তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।"

জয়নারায়ণের জন্ম ১৮০৬ সালের এপ্রিলে। চব্বিশ পরগণা জেলার মুচাদিপুর গ্রামে। জয়নারায়ণের বাবার নাম হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জয়নারায়ণ বাল্যকালে বাবার কাছে ব্যাকরণ প্রভৃতি ও ধর্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছেন। তারপর রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের কাছে অলঙ্কারশাস্ত্র, শালিখার জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের কাছে ন্যায়শাস্ত্র এবং গুজরাটি পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রীর কাছে বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর জয়নারায়ণ শালিখায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছেন।

নানা জায়গা থেকে ছাত্রেরা সেই চতুষ্পাঠীতে পড়তে এসেছে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "এই সময়ে, তর্কপঞ্চাননের এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে, ছাত্রগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করেন। তৎকালীন বিদেশীয় বিদ্যার্থিগণের ভোজনাদির ব্যয়ভার অধ্যাপকের উপরেই নির্ভর করিত। তর্কপঞ্চাননের পিতা কেবল তাঁহার নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঁচটী করিয়া টাকা মাসে মাসে দিতেন। তর্কপঞ্চানন যা কিছু নিমন্ত্রণে বিদায় প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দারা ছাত্রগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত না। সুতরাং, তিনি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়া, সাতিশয় কষ্টকর অবস্থায় পড়িলেন; তথাপি তাঁহার উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই। অনন্তর শালিখানিবাসী কতিপয় সদাশয় লোক তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের সাহায্য করিতে লাগিলেন।" ওই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতে করতেই জয়নারায়ণ হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় পাশ করেছেন।

তারপর ১৮৪০ সালের ১৪-ফেব্রুআরি জয়নারায়ণ সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির কাছে একখানা আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। আবেদনপত্রখানা তুলে দিচ্ছি:

"মহামহিম শ্রীযুক্ত কাপ্তেন মার্ষল সাহেব,

সংস্কৃত পাঠশালাধ্যক্ষ মহাশয়, সমীপেষু—

শ্রীজয়নারায়ণতর্কপঞ্চাননস্যাবেদনমিদং গত ১২ই ফেব্রুওরি বুধবার উক্ত পাঠশালার ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক ৺নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে। এইক্ষণে আমি ঐ কর্ম্মের প্রার্থনা করি। অতএব মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই আবেদন কমিটির গোচর করাইতে আজ্ঞা হয়।

আমি ন্যায়শাস্ত্র বহুদিবসাবধি অনেক ছাত্র লইয়া ক্রমিক অধ্যাপনা করিতেছি এবং পাঠশালার ব্যবহার্য্য ব্যাকরণকাব্যালঙ্কারাদিশাস্ত্র প্রায় তাবৎ অধ্যয়ন করাইতে সমর্থ। কদাচিৎ যদি অন্য কোন পণ্ডিত পাঠশালায় অনুপস্থিত হয়েন তদা তৎকার্য্য আমা হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক। বিশেষত: আমি লা কমিটির সার্টিফিকেট্ ও অন্যান্য অনেক খ্যাত্যাপন্ন পণ্ডিতদিগের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উক্ত ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক জীবদ্দশায় আমাকে স্বীয় কর্ম্মপ্রতিনিধি দিতে মহাশয় সমীপে আবেদন করেন। তাহাতে কমিটির পরীক্ষা দিতে আজ্ঞা হয়। আমিও তদনুসারে অন্য কতিপয় পণ্ডিতের সহিত ২রা নবম্বরে পরীক্ষা দিয়াছি, কিন্তু ঐ পরীক্ষাকালে পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন মহাশয় আমার অত্যন্ত প্রতিকূলাচরণপূর্ব্বক প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নষ্ট করিয়াছেন। তাহা মহাশয় স্বয়ং এবং অন্যান্য যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিলক্ষণ বিদিত আছেন। উক্ত বাবু পরীক্ষাকালে তাদৃশ ব্যাঘাত না জন্মাইলে যেরূপ উত্তর লিখিয়াছি তদপেক্ষা উত্তমোত্তর লিখিতে পারিতাম ইহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক এইক্ষণে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেও যে তিনি আমার পক্ষে যথার্থ বিবেচনা করিবেন তাহা পরীক্ষাকালের ব্যবহার দ্বারা বোধ হয় না। আরো শ্রবণ করিতেছি অস্মৎসহিত পরীক্ষিত জনৈক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে উক্ত পণ্ডিতের ও আমার উত্তরপত্রের সংস্কৃত রচনার শুদ্ধাশুদ্ধি ও প্রশ্নানুযায়ী

উত্তরের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিষয় উত্তম পণ্ডিত দ্বারা বিবেচনা করেন। উক্ত বাবুর সম্মত ঐ হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ জানেন না এবং কাব্যাদিশাস্ত্রাবিজ্ঞ ও অল্পবয়স্ক ও কদাচ অধ্যাপনা করেন নাই। আত্মবোধ হইতে পরবোধনা সুকঠিনা এবং বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণকে তদ্দেশীয়াধ্যাপকের ন্যায় বিদেশীয়াব্যবসায়ী অবহুদর্শী পণ্ডিতের সুশিক্ষা কদাচ সম্ভবে না, তাহা ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই সপ্রমাণ হইবেক। অতএব প্রার্থনা এই যে এ-বিষয় মহাশয় কমিটিতে জানাইয়া যথার্থ বিবেচনা দ্বারা যাহার প্রাপ্য হয় তাহাকে দেন। আমি আরও নিবেদন করিতেছি যে কমিটি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে আমি ছাত্রগণকে বিলক্ষণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠনা ও উত্তমরূপে প্রশ্নোত্তর শিক্ষাদ্বারা শ্রীযুক্তেরদিগের পরিতোষ সম্পাদন করিবো। ইহাতে কোনো প্রকারে ঔদাস্য হইবে না ইতি।"

১৮৪০ সালের ১১-আগস্ট জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। মাইনে আশি টাকা। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষতার সহিত অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি কলেজের কর্ম্ম স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা প্রবৃত্তি গেল না। তিনি কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়ায় সংস্থাপিত চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় বিদ্যার্থিগণকে প্রাতে ও রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ বিদ্যাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া, তর্কপঞ্চানন সিমুলিয়ার চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নারিকেলডাঙ্গা নামক স্থানে অপেক্ষাকৃত এক প্রশস্ত বাটী ক্রয় করিয়া, তথায় অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।" সংস্কৃত কলেজে শেষপর্যন্ত জয়নারায়ণের মাইনে বাড়তে বাড়তে ১২০৲ টাকা হয়েছিল।

হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন লিখেছেন: "তিনি (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন) কখন পুস্তক স্পর্শ করিতেন না। সকল পুস্তকই তাঁহার মুখস্থ ছিল। পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা কেবল প্রথম লাইনের

কিয়দংশ বলিয়া দিতাম, তাহার পর আর তাঁহাকে কিছুই বলিয়া দিতে হইত না। তাঁহার শরীর স্থূল ও দীর্ঘ ছিল। পড়াইবার সময় তিনি বাম হস্তের তল তাঁহার কেশশূন্য মস্তকে বুলাইতেন, এবং পাঠ্যগুলি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। অন্যান্য অধ্যাপকগণের সঙ্গে তাঁহার একটু প্রভেদ ছিল। অন্যান্য অধ্যাপক-মহাশয় স্বহস্তে কাল কাপড়ের ছাতি ধরিয়া কলেজে আসিতেন। তর্কপঞ্চানন-মহাশয় কিন্তু নিজে ছাতি ধরিতেন না। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড তালপাতার ছাতি ছিল। তাহার পরিধি প্রায় ১০।১২ হাত হইবে, এবং দণ্ডটি প্রায় ৮ হাত হইবে। একজন চাকর ঐ বৃহৎ তাল-পত্রের ছত্র স্কন্ধে করিয়া আসিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি যষ্টি হস্তে করিয়া ঐ ছত্রের ছায়ায় 'থপ্ থপ্' করিয়া চলিয়া আসিতেন। তর্কপঞ্চানন-মহাশয়ের বাড়ী নারিকেলডাঙ্গায় ছিল। একটি দোতালা কোটা ও দুখানি লম্বা খোড়ো ঘর ছিল। কোটাতে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। একটি খোড়ো ঘরে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের কার্য্য চলিত; আর-একখানিতে ছাত্রগণ বাস করিতেন।"

জয়নারায়ণ প্রায় তিরিশ বছর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা করেছেন। ১৮৬৯ সালের ৩-নভেম্বর থেকে তিনি পেনসন নিয়েছেন, মাসে ৫৭।০ পেনসন পেয়েছেন। ১৮৭২ সালের ১২-নভেম্বর কাশীতে জয়নারায়ণের মৃত্যু হয়েছে।

'Epicurean' শব্দটির অর্থ: ভোগবিলাসী। উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean ছিলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন—"কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ও সব এ দেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতি কল কব্জা এখানে করাবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।"

এ-পর্যন্ত জয়নারায়ণ রচিত ও সম্পাদিত এগারোখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে: উদয়নাচার্য-কৃত 'আত্মতত্ত্ববিবেকঃ', কণাদসূত্র-বিবৃতিঃ; সর্বদর্শন সংগ্রহ; গোতম-মুনি-কৃত 'ন্যায়দর্শনম্' বাৎস্যায়ন-

ভাষ্য সমেত; পদার্থতত্ত্বসারঃ; আনন্দগিরি-কৃত 'শঙ্করবিজয়ঃ'; নীরাজনপ্রকাশঃ; স্বরসংক্রমদীপিকা; তারকেশস্তবঃ; বচঃপুষ্পাঞ্জলিঃ (চামুণ্ডাশতকং); পদ্যপদ্মমালানামিকা ভৈরবপঞ্চাশিকা।

বড়ো শান্ত স্বভাবের মানুষ জয়নারায়ণ। তাঁর উদারতা, সারল্য ও বিনয়ের কোনো তুলনা নেই। ১৮৭২ সালের ২৬-নভেম্বর 'সুলভ সমাচার' লিখেছে: "তিনি (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন), স্থূলকায় ছিলেন ও ইদানীং এক প্রকার অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি একখানি সামান্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া করিয়া কলেজে আসিতেন। একদিন কলেজ হইতে যাইবার সময় তিনি গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় স্কুলের এক-পাল ছোট ছোট ছেলে তাঁহার গাড়ির পিছন ও চাকা ধরিয়া পিছনদিকে টানিতে লাগিল; ঘোড়া আর চলিতে পারে না; গাড়োয়ান মহারাগে বকাবকি করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলেরা শুনে না; অবশেষে তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "ও বাবারা, তোমরা টানিলে ঘোড়া যাবে কেন?" ছেলেরা আরও আনন্দ পাইল, এবং আরও টানাটানি করিতে লাগিল। অবশেষে অন্য একজন আসিয়া ছেলেদের হস্ত হইতে তাঁহার গাড়ি উদ্ধার করিয়া দিল। তিনি স্বভাবতঃ এমনি শান্ত-প্রকৃতি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁহার মন আবার এমন উদার ছিল যে, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল মত ও ভাল ভাল কথা বলিলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন এবং ইংরাজদিগের শাস্ত্রের উপর তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা বাড়িত। একদিন ন্যায় পড়াইবার সময় ন্যায়ের যেখানে আছে যে বায়ুর ভার নাই, সেইখানে একজন ছাত্র বলিলেন যে "বায়ুর ভার আছে"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! কেমন করিয়া জানিলে?" তাহাতে সেই ছাত্র যে-উপায়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাতাসের ভার সপ্রমাণ করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া তিনি ৫।৭ মিনিট চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "দেখ দেখি বাবা, এই উপায়টী

না জানার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এমন সত্যটী জানিতে পারেন নাই।" এমন কি তিনি "পদার্থতত্ত্বসার" নামে যে ন্যায়ের গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক ইংরাজ মত নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার আর একটী বিশেষ গুণ এই ছিল যে তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। একটু বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী দেখিলে তিনি একেবারে মোহিত হইতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে যে, তিনি নিজকৃত কবিতা আনিয়া ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন, "বাবারা, একবার দেখিয়া কাটিয়া কুটিয়া দেও দেখি, তোমরা আমা অপেক্ষা এসব বোঝ ভাল।" বাস্তবিক তাঁহার সরলতা ও বিনয় মনে হইলে গায়ে কাঁটা দেয়।"

ন্যায়শ্রেণীতে ঈশ্বরকে পড়তে হয়েছে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র ও কুসুমাঞ্জলি।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "যৎকালে অগ্রজ (ঈশ্বরচন্দ্র) ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পীড়িত হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় দাদাকে (ঈশ্বরচন্দ্র) উপযুক্ত পণ্ডিত বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া, ২ মাসের জন্য অগ্রজকে (ঈশ্বরচন্দ্র) প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত থাকিয়া ৪০ টাকা প্রাপ্ত হন, সেই টাকা পিতৃদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন, এই টাকায় পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াধাম প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করুন। ছেলেমানুষ পিতাকে তীর্থক্ষেত্রে যাইতে উপদেশ দিতেছেন, এই কথায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম আহ্লাদিত হইলেন।"

এখানে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঈষৎ ভুল করেছেন। সেসময়ে ঈশ্বর দু-মাস নয়, চারমাস (১৮৪০ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর) অধ্যাপনা করেছে এবং চল্লিশ টাকা নয়, আশি টাকা পেয়েছে। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি, ১৮৪১ সালের ৯-জানুআরি, হিসেব দাখিল করে লিখেছেন: 'Compensation allowed to Ishwarchundar being employed as an acting pundit of the 1st.

Grammar class from August to November @ 20 Rs. per month=80/-"

১৮৪০-৪১ সালে ন্যায়শ্রেণীর দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বর একাধিক বিষয়ে পুরস্কার পেয়েছে। ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পেয়েছে একশো টাকা; দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য আট টাকা; বাঙলায় কোম্পানির রেগুলেশ্যন বিষয়ে পরীক্ষায় পঁচিশ টাকা। তাছাড়া সংস্কৃতে পদ্য লিখে একশো টাকা। 'অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা' বিষয়ে পদ্য।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি লিখেছেন:

"On the 21st March (1841), 10 students presented themselves, as competitors for the prize for poetical composition. The pundits and myself are unanimously of opinion, that Ishwarchundar* deserved the prize,—100 Rupees."

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"...মাননীয় বাবু রসময় দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি, অগ্নীধ্র রাজার তপস্যাসংক্রান্ত কতিপয় কথা লিখিয়া দিয়া, আমাদিগকে বলিয়া দেন, এই বিষয়ে শ্লোকরচনা কর। তাঁহার লিখিত কথাগুলি অবলম্বন পূর্ব্বক, নিম্নমুদ্রিত দশটি শ্লোকের মধ্যে, ১।২।৩।৪।৯।১০ এই ছয়টি রচিত হইয়াছিল; আর, ৫।৬।৭।৮ এই চারিটি আমার ইচ্ছা অনুসারে রচিত অতিরিক্ত শ্লোক। এই শ্লোকচতুষ্টয় রসময় বাবুর সাতিশয় প্রীতিপদ হইয়াছিল।

অগ্নীধ্রো নাম ভূমীন্দ্রঃ প্রজারঞ্জনবিশ্রুতঃ।
আরাধয়ৎ সুতাকাঙ্ক্ষী গিরিপ্রস্থে প্রজাপতিম্ ॥১॥
ভগবান্ সোঽথ তজ্‌জ্ঞাত্বা প্রেষয়ামাস সত্বরম্।
প্রযত্নতঃ পূর্ব্বচিত্তিং নাম কামপি কামিনীম্ ॥২॥

* This individual was also recommended to the first prize in the Nyaya class, and gained the previous year the Poetical Composition prize.

নৃপতিস্তাং সমালোক্য কান্ত্যা ত্রৈলোক্যমোহিনীম্।
শ্লোকানুবাচ কতিচিজ্জড়বন্মোহমাশ্রিতঃ ॥৩॥

আলীঢ়নীরদচয়ে শিখরৈরুদগ্রৈর্
উচ্চাবচৈরজগরৈরভিতো বিকীর্ণে।
ক্রব্যাদনৈরগণনৈর্ভয়মাদধানে
কিং নু ব্যবস্যসি মুনীশ্বর ভূধরেঽস্মিন্ ॥৪॥

কোদণ্ডযুগ্মমিদমদ্ভুতমম্বুজাক্ষি
ধৎসে কিমর্থমথবা হরিণোপমানাম্।
বালে বশীকরণবাসনয়া নিতান্তম্
অস্মাদৃশাং হন্তদৃশামজিতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥৫॥

বাণাবিমৌ বিবিধবিভ্রমমন্থরৌ তে
পুঙ্খং বিনাপি রুচিরৌ নিশিতাগ্রভাগৌ।
ধাতুঃ কটাক্ষপতিতায় হতাশ্রয়ায়
কস্মৈ প্রয়োক্তুমভিবাঞ্ছসি তন্ন বিদ্মঃ ॥৬॥

যদ্দৃশ্যতে সুমুখি বিম্বফলং মনোজ্ঞং
মধ্যে সুবর্ণপরিকল্পিতবাগুরায়াঃ।
জানীমহে ন হি করিষ্যতি কস্য যূনশ্
চেতোবিহঙ্গমশিশোর্বিপুলাং বিপত্তিম্ ॥৭॥

অস্মিন্ নিরাকৃতকলঙ্কশশাঙ্কবিম্বে
নীলাম্বুজন্মযুগলং যদিদং বিভাতি।
মন্যে সুধাংশুমুখি সংবননং বিধাত্রা
লোকত্রয়স্য বিহিতং মহতাদরেণ ॥৮॥

যুষ্মচ্ছিখাবিগলিতা ললিতা নিতান্তং
শিষ্যা ইমে মুনিবরানুগতা ভবন্তম্।
প্রীতা ভজন্তি বিমলাং কিল পুষ্পবৃষ্টিং
ধর্ম্মব্রতা মুনিসুতা ইব বেদশাখাম্ ॥৯॥

তস্মাদ্বয়ং ভয়পরিপ্লববুদ্ধয়স্তাম্
অভ্যর্থয়ামহ ইদং চটুলায়তাক্ষি।

উত্তন্ বিজেতুমবনীং তব বিক্রমোহয়ম্
অস্মাকমস্তু কুশলায় নিরাশ্রয়াণাম্ ॥ ১০ ॥"

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মাঝে-মাঝে বলতেন—ঈশ্বরের মতো বুদ্ধিমান ছাত্র আমার চোখে পড়েনি। পড়ানোর সময় মনে হত যেন কতকাল আগে থেকে ঈশ্বর ওসব শাস্ত্র ভালো করে জেনে রেখেছে।

ঈশ্বর জয়নারায়ণের প্রিয়শিষ্য, ঈশ্বরের কথা তিনি কখনো ভোলেননি।

১৬৬৮ সালে প্রকাশিত "শঙ্করবিজয়ঃ" গ্রন্থে জয়নারায়ণ বিশেষভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন :

"শ্রীযুক্তেশ্বরচন্দ্রাখ্যো বিদ্যাসাগরসজ্ঞিতঃ।
যস্মান্ন্যায়াদিশাস্ত্রাণি বিখ্যাতোহধীতবান্ পুরা ॥"

অর্থাৎ—যাঁর (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন) কাছে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অতীতে ন্যায়াদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

জয়নারায়ণ তখন কাশীতে। ঈশ্বরচন্দ্র তখন অনেক বড়ো হয়েছেন, একবার দেখা করতে গেলেন তাঁর সঙ্গে। প্রিয়শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখে জয়নারায়ণ উচ্চকণ্ঠে বললেন—আজ দ্রোণের আবাসে অর্জুন এসেছেন।

দশ

আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক।

ক্রমশ সংস্কৃত রচনা বিষয়ে ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ সাহস ও উৎসাহ জন্মেছে। তারপর সময়ে-সময়ে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় কোনো-কোনো বিষয়ে শ্লোক লিখেছে। একবার ঈশ্বর মেঘবিষয়ে দশটি শ্লোক লিখেছে :

"প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্ত্তুমীশতে সর্ব্বে।
জলদাঃ প্রাবৃডপায়ে পরিহীয়ন্তে শ্রিয়া নিতরাম্॥ ১॥
কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলবর্জ্জিতেন
তোয়েনবৃদ্ধিমুপগন্তুমধীশতে তাম্।
ন স্যাদজস্রগলিতং যদি পন্থিযূনাং
সাহায়কায় কিল নির্ম্মলমশ্রুবর্ষম্॥ ২॥
কান্তাভিসাররসলোলুপমানসানাম্
আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকাণাম্।
যদ্ বিঘ্নকৃদ্ দুরিতমর্জ্জিতবানজস্রং
কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্মঃ॥ ৩॥
ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং
নো নির্দ্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্।
ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশং গতঃ সন্
আস্তে তবাপি নিয়তস্তডিতা বিয়োগঃ॥ ৪॥
সর্ব্বত্র সন্নমৃতদস্তটিনী শরীর—
সংবর্দ্ধকস্তনুভৃতাং শমিতোপতাপঃ।
যচ্চাতকেষু করুণাবিমুখোঽসি নিত্যং
নায়ং মতো জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ॥ ৫॥

লোকোত্তরা যদিচ তোদয় তে প্রবৃত্তির
এষা যদব্ধিসরিতোরসি সঙ্গহেতুঃ।
জাগর্ত্তি সজ্জনসভাসু তথাপি ঘোরং
ত্বৎকহ্লষং কৃপণপান্থবধূবধোত্থম্ ॥৬॥
ত্বং হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্মমঙ্গং
ত্বদ্‌গর্জ্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গবৈরি।
কস্তবাং স্তুবীত বদ তোয়দ লোকসিদ্ধং
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে ॥৭॥
কান্তাবিয়োগবিষজর্জরপান্থযূনাং
ত্বং জীবনাপহরণব্রতদীক্ষিতোহসি।
ত্বামামনন্তি ঘন জীবনদায়িনং যৎ
কিং স ভ্রমো ন বদ তৎ স্বয়মেব বুদ্ধা ॥৮॥
গর্জ্জন্ ভৃশং তত ইতঃ সততং বৃথা কিং
নো লজ্জসে জলদ পান্থনিতান্তশত্রো।
আস্তে হি নান্যগতিচাতকপোতচঞ্চু-
সম্পূরণেহপি বত যস্য ন শক্তিযোগঃ ॥৯॥
জীমূত চাতকগণং ননু বঞ্চয়িত্বা
মা মঞ্চু বারি সরসীসরিদর্ণবেষু।
কং বা গুণং শিরসি সংস্তুতৈলেলেপে
তৈলপ্রদানবিধিনা লভতেহত্র লোকঃ ॥১০।”

সংস্কৃত কলেজে প্রায় তিন বছর ন্যায়শাস্ত্র পড়েছে ঈশ্বর। আর এরই মধ্যে, খুব সম্ভব, ঈশ্বর কিছুকাল যোগধ্যান মিশ্রের কাছে জ্যোতিষশ্রেণীতে পড়েছে। ১৮২৬ সালের মে মাসে যোগধ্যান মিশ্র সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষশ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, মাইনে আশি টাকা। সংস্কৃত কলেজে আসার আগে যোগধ্যান দু-বছর উইলসন সাহেবের কাছে কাজ করেছেন।

উইলসন সাহেব, ১৮৩২ সালের ৩০-ডিসেম্বর, লিখেছেন: "Yogadhan Misra has been employed a teacher of Arithmetic in the Sanskrit College for about 5 or 6 years. He is possessed

of a respectable knowledge of the science, and of other which come under the term of Jyotish......"

সংস্কৃত কলেজে যোগধ্যান প্রায় তেইশ বছর অধ্যাপনা করেছেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "তিনি (যোগধ্যান মিশ্র) সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণকে লীলাবতী ও বীজগণিতের অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। তৎকালে তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।"

জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের সেক্রেটারি সাদারল্যাণ্ড সাহেব, ১৮৩৩ সালের ১৪-আগস্ট, যোগধ্যানকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন:

"In reply to your application of the 30th ultimo I am desired by the General Committee of Public Instruction to inform you that they have been pleased to grant you 500 Rs. as a remuneration for your translating part of *Rekha Ganita*.

The manuscript translation made by you is to be delivered into the committee office."

বাঙলা ও নাগরী অক্ষরে বই ছাপানোর সুবিধার জন্য যোগধ্যান বড়বাজারে 'সারসুধানিধি' নামে একটি ছাপাখানা খুলেছেন; সেখান থেকে তিনি, হটনের ইংরেজী বই অবলম্বনে, ১৮৩৯ সালে 'ক্ষেত্রতত্ত্ব-দীপিকা' নামে একখানা বই দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করেছেন, এ-কাজে তাঁর সহযোগী হরচন্দ্র ও ওলাষ্টন সাহেব। যোগধ্যানের আরো কয়েকখানা বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে: বিবাদচিন্তামণি; নির্ণয়সিন্ধু; বীজগণিত; পশ্বাবলী। ১৮৪৯ সালের ২১ নভেম্বর কাশীতে যোগধ্যানের মৃত্যু হয়েছে। যোগধ্যান খুব নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন।"

ঈশ্বর ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়েই জগদ্দুর্লভ সিংহের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। জগদ্দুর্লভ বাড়ির সদরের

সমস্ত ঘর ভাড়া দিয়ে দিলেন তনসুকদাস হিন্দুস্থানীকে। ঈশ্বরদের জায়গা দিলেন অন্দরমহলে, নিচতলার ঘরে।

ঈশ্বর অসুখে পড়ল।

চিকিৎসকেরা ঠাকুরদাসকে বললেন—নিচের ঘরে থেকে ঈশ্বরের একবার কঠিন অসুখ হয়েছিল, অনেক কষ্টে সেরে উঠেছে। ওরকম ঘরে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। যত তাড়াতাড়ি পারেন, এ-বাড়ি ছেড়ে যান।

এসব কারণে বড়বাজারের বাসা ছেড়ে দিতে হল। ঠাকুরদাস বাসা নিলেন বৌবাজারে, পঞ্চাননতলায়, আনন্দচন্দ্র সেনের বাড়িতে। সেখানে প্রায় তিন বছর কেটেছে। তারপর ভাড়া নেওয়া হয়েছে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানার দুটি ঘর। এবং কিছুকাল পরে সমস্ত বৈঠকখানা, ভাড়া লাগত মাসে আট টাকা।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র যখন, তখনই ঈশ্বরের উপনয়ন হয়ে গেছে। উপনয়নের সময় ঈশ্বরের বয়স এগারো বছর।

তারপর ঈশ্বরের বিয়ের কথা!

প্রথমে রামজীবনপুরের আনন্দচন্দ্র অধিকারী সম্বন্ধ করে গেলেন। তাঁদের যাত্রার দল ছিল; সেজন্য ঈশ্বর ওখানে বিয়ে করতে রাজী হল না। ঠাকুরদাসের পাকা বাড়ি নেই, খড়োঘর; ঠাকুরদাস বড়মানুষ নন—এই কারণে আনন্দচন্দ্রও ঠাকুরদাসের সঙ্গে কুটুম্বিতায় রাজী হলেন না। সম্বন্ধ ভেঙে গেল।

পরে জগন্নাথপুরে চৌধুরীদের বাড়িতে সম্বন্ধ হল। কিন্তু নানা কারণে সেখানেও বিয়ে হল না।

শেষপর্যন্ত রামমণি ঠাকরুন আর ঈশ্বরের ঠাকুমা ক্ষীরপাই গ্রামে সম্বন্ধ করলেন। ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের মেয়ের সঙ্গে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "(শত্রুঘ্ন) ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষীরপাই গ্রামের মধ্যে ক্ষমতায়, মান্যে ও সদ্ব্যয়ে সর্ব্বপ্রধান লোক ছিলেন।"

ভারি আশ্চর্য স্বভাবের মানুষ শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য। তাঁর নামে

অনেক কাহিনী আছে।

ক্ষীরপাইতে গাজন হত প্রত্যেক বছর।

একবার ক্ষীরপাইয়ের একজন হালদারমশায় শত্রুঘ্নের বিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, গাজনের দল নিয়ে শত্রুঘ্নকে তাঁর পাড়ায় যেতে দেবেন না।

গাজনের দল বেরল যথাসময়ে। এই পাড়ার দিকে এগোতে লাগল।

কিন্তু দেখা গেল হালদারমশায়ের দল চুপচাপ বসে নেই। গাজনের দলের পথ বন্ধ করার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছেন।

পথে একটা হাতি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। হাতির পিছনে একখানা রথ। আরো পিছনে বিপক্ষ দলের লোকজন।

শত্রুঘ্ন ভট্টচার্য কোনো বাধায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না। পথ থেকে একখানা ইট কুড়িয়ে নিলেন। হাতি আছে প্রথমে। হাতির শুঁড় বগলে চেপে রেখে ইটের টুকরো দিয়ে এমন মার লাগালেন যে হাতিটা পথ ছেড়ে দিল।

তারপর রথ। একটানে রথখানা ফেলে দিলেন শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য।

কাণ্ড দেখে বিপক্ষ দলের লোকজন তাড়াতাড়ি পথ দেখল। পালিয়ে গেল।

কিন্তু শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য তখন রেগে আগুন হয়ে উঠেছেন। তিনি একলা বিপক্ষ দলের পিছনে ছুটলেন। হালদারমশায় ভয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ছুটতে-ছুটতে শত্রুঘ্ন ভট্টচার্য বন্ধ দরজার সামনে এসে পড়লেন। লোহার খিল লাগানো দরজা। লাথি মেরে দরজা ভেঙে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

পায়ে একটা পেরেক ঢুকে গেছে। কিন্তু সেদিকে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের লক্ষ্য নেই। কে একজন এসে তাঁকে ধরে ফেললেন, বললেন—ভট্টাচার্য, করেছ কী, তোমার পায়ে যে পেরেক ফুটেছে।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বললেন—বটে বটে, পেরেকটা টেনে বের করে নাও।

কিন্তু সেটা হল না। একটা ইট এসে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের গায়ে লাগল। ও-পক্ষ এমনভাবে ইট মেরেছে যে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের আর ছুটবার শক্তি রইল না। ধরাধরি করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে হল।

ইটটা সাংঘাতিক লেগেছে বটে। ও-পক্ষ ভাবল, শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বোধ হয় আদালতে নালিশ-ফৌজদারি করবে, একটা দারুণ কাণ্ড হয়ে যাবে তাহলে।

খবর নেবার জন্য হালদারমশায়ের একজন চর এল।

চরের মুখ দেখেই শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য হালদারমশায়ের মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন—হালদার ভেবেছে, আমি নালিশ করব। নালিশ করব কি রে! উকিল-পেয়াদাকে পয়সা খাওয়াব? এবার সে মেরেছে, আগামীবার আমি মারব। নালিশ-ফৌজদারী করলে কি আর গাজন থাকবে?

চর তো চলে গেল। তারপর হালদারমশায় সদলে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের বাড়িতে এসে উপস্থিত। ক্ষমা চাইতে এসেছেন।

হালদারমশায় বললেন—ভট্টাচার্য, তোমার বল পরীক্ষা করব বলে ওরকম করেছিলাম। তুমি দ্বিতীয় ভীম বটে। তোমার শুধু বল নয়, মনুষ্যত্ব আছে, তোমার তেজ আছে, ভবিষ্যৎ ভাববার বুদ্ধি আছে। আমায় ক্ষমা করো।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বললেন—এসব কথায় আর কাজ নেই। আজ আমার বাড়িতে তোমাদের সকলকে খেয়ে যেতে হবে।

সেদিন বিপক্ষের সকলকে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের বাড়িতে পরমানন্দে খাওয়া-দাওয়া করে বিদায় নিতে হল।

আরেকদিন শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য একটা দোকানে বসে আছেন, সেখানে আরো অনেকে উপস্থিত, দোকানে একটা চারমণী কলাইয়ের বস্তা এলো। সকলে বলল—ভট্টাচার্য! তুমি যদি এই বস্তা বয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারো, তাহলে তোমাকে এই কলাই দি।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বললেন—পারি বটে, কিন্তু সোজা হয়ে যাব না, দু-পা ও দু-হাত মাটিতে রেখে গোরুর মতো যাব। তোমরা

আমার পিঠে একখানা লেপ দিয়ে তারপর কলাই চাপিয়ে দেবে।

তাই হল। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের বাড়ি সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। পিঠে চারমণী কলাইয়ের বস্তা নিয়ে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বলদের মতো হাঁটাপথ ধরলেন, সঙ্গে চলল বিস্তর লোক। সেই-ভাবেই শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বাড়ি এলেন। যেমন কথা ছিল, সকলে তখন শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যকে সব কলাই নিয়ে নিতে বলল।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বললেন—আমি কলাই নিয়ে কী করব? কোথায় রাখব? তোমরা চাল তরকারি-টরকারি নিয়ে এস, এই কলাইয়ের ডাল হোক, রেঁধে-বেড়ে সকলে আনন্দ করে খাই।

তাই হল।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের দাপটে সেসময়ে অনেক দস্যু-লেঠেল জব্দ হয়েছে।

গ্রামে একজন সদ্‌গোপ খালের কাছে বেনাবনের মধ্যে লোক ঠেঙিয়ে মারে। ওই সদ্‌গোপটির পদবী—ঘোষ। গ্রামের লোক সবসময়ে ঘোষের জন্য ভয়ে-ভয়ে থাকে। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের দাদা একদিন তাঁকে বললেন—শতু! তুই থাকতে ঘোষ জব্দ হয় না?

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বললেন—তার আর কি, এতদিন তো বলো নি।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য কথা দিলেন যে ঘোষকে জব্দ করবেন।

একদিন সকালবেলা বেনাবনে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত বনে আলোড়ন, ভট্টাচার্য বুঝলেন, ঘোষ কাউকে ধরেছে। ঠিক, সেদিন ঘোষ একজন পশ্চিমে হিন্দুস্থানীকে ধরেছে, তার গায়েও খুব জোর, ঘোষ তাকে সহজে কাবু করতে পারেনি, দুজনে ধস্তাধস্তি হচ্ছে।

আর লুকিয়ে রইলেন না, শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য সামনে গিয়ে উপস্থিত।

তাঁকে দেখেই হিন্দুস্থানীকে ছেড়ে দিয়ে ঘোষ সামনের একটা শিমুল গাছে উঠে পড়ল।

এদিকে হিন্দুস্থানীটি অজ্ঞান হয়ে গেছে, শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য তার

মুখে জল দিলেন, আর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

তারপর শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য শিমুলগাছের তলায় গেলেন। গাছে উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মোটাসোটা মানুষ বলে গাছে উঠতে পারলেন না। শিমুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন—ঘোষ! তুই কতক্ষণ থাকবি? তোকে না মেরে আমি যাব না।

গাছের উপর বসে থরথর করে কাঁপতে লাগল ঘোষ, কিছুতেই সে গাছ থেকে নামল না।

অগত্যা শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য ঘোষকে বললেন—নেমে আয়। আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর যে আর এ-কাজ করবি না। তাহলে এ-যাত্রা তোকে ক্ষমা করব।

ঘোষ বলল—তুমি পইতে ছুঁয়ে দিব্যি করো, আমি নেমে গেলে আমাকে মারবে না, তাহলে আমি নামব।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য হেসে বললেন—আমি পইতে ছুঁয়ে দিব্যি করলে তোর বিশ্বাস হবে কেন?

ঘোষ বলল—আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করলে তুমি বিশ্বাস করবে, আর তুমি বামুন পইতে ছুঁয়ে দিব্যি করলে আমি বিশ্বাস করব না?

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য তখন পইতে ছুঁয়ে দিব্যি করলেন। ঘোষ নেমে এসে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের পা ছুঁয়ে দিব্যি করল, তিনি ক্ষমা করলেন, ঘোষ চলে গেল।

তারপর ওই হিন্দুস্থানীটিকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বাড়ি এলেন। ওকে খাওয়া-দাওয়া না করে যেতে দিলেন না।

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "একবার তাঁহার (শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য) পৃষ্ঠব্রণ হয়। ডাক্তার অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে "ক্লোরোফরম্" করিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিবার উপক্রম করেন। তিনি বলিলেন,—"অজ্ঞান করবে কেন? অস্ত্র কর, আমি অজ্ঞান হইয়া আছি।" ডাক্তার ছুরি বসাইলেন, ছুরি ভাঙ্গিয়া গেল। আবার ছুরি আনিয়া তবে অস্ত্র করিতে হয়।"

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র যখন, তখনই ঈশ্বরের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের সময় ঈশ্বরের বয়স বোধ হয় চোদ্দ বছর। ঈশ্বরের বৌয়ের নাম দিনময়ী, শ্বশুরের নাম শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "অগ্রজের (ঈশ্বরচন্দ্র) বিবাহ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। যাবজ্জীবন লেখা পড়া শিখিব, সাধ্যানুসারে দেশের উপকার করিব, এই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কেবল পিতার ভয়ে অগত্য বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।"

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন—বন্দ্যোপাধ্যায়! তোমার টাকাকড়ি নেই, তোমার ছেলে বিদ্বান হয়েছে, শুধু সেইজন্যই আমার আদরের মেয়ে দিনময়ীকে তোমার ছেলের হাতে দিলাম।

বিয়ের পর ঈশ্বর একদিন ঠাকুমাকে বলল—এখন নাতির বিয়ে দিলে, নাতবৌ নিয়ে নৃত্যগীত আমোদ-আহ্লাদ করো। কিন্তু, দেখো, যেন ছেঁড়া চ্যাটাই বিছানায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখো না।

ঠাকুমা বললেন—দেখিস, আজ থেকে যে স্বপ্ন দেখব তা সত্য হবে। কত লাখ টাকা তুই পাবি, এ ছেঁড়া চ্যাটাই আর থাকবে না।

১৮৪১ সালের ৪-ডিসেম্বর ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজের সার্টিফিকেট পেল।

তাছাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা ঈশ্বরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা আলাদা একখানা প্রশংসাপত্র দিয়েছেন:

"অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়ং শ্রীযুক্ত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিত শাস্ত্রাণ্যধীতবান্

ব্যাকরণম্	…শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্	…শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্	…শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্	…শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্	…শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ

জ্যোতিঃশাস্ত্রম্ ...শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ

ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ ...শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্যৈতস্যৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

Rassomoy Dutt, Secretary.
10th December, 1841."

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া সাঙ্গ করে নয়, সংস্কৃত কলেজে পড়তে-পড়তেই ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে একটি উপাধি দেখা গেছে। সেই উপাধি—বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সংস্কৃত কলেজের কেরানী রামধনের পরম স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে এসেছেন, রামধন তখনো সংস্কৃত কলেজের কেরানী, বিদ্যাসাগরকে দেখে রামধন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতেন। বিদ্যাসাগর একদিন রামধনকে বললেন—আমি আপনার সেই স্নেহপাত্র আছি, আপনি অমন করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

এখানে একটা দুঃখের কথা আছে। অনেকদিন পরের একটা কথা।

বিদ্যাসাগর তখন বৃদ্ধ। একদিন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশোনা করি, কিন্তু কই তা হল! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।

পড়াশোনা করা হল না বলে বৃদ্ধবয়সে বিদ্যাসাগরের এই চোখের জলের কোনো তুলনা নেই।

—

প্রমাণ পঞ্জী

Account Books relating to Sanskrit College (1823-41); Copy book of letters received and issued by the General Committee of Public Instruction (1830-41); Correspondence and proceedings of the General Committee of Public Instruction (1830-41); Judicial (Civil) proceedings Nos. 10-11 dated 28th May 1839; Reports of the General Committee of Public Instruction (1836-39); Report of the late General Committee of Public Instruction for 1840-41 and 1841-42; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ভূগোলখগোলবর্ণনম্, শ্লোকমঞ্জরী, সংস্কৃত রচনা ; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর ; তারাকুমার কবিরত্ন : কবিবচনসুধা ; পূর্ণচন্দ্র দে : কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, 'বঙ্গবাণী', শ্রাবণ ও আশ্বিন, ১৩২৯ ; বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত) ; বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়) ; বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য : জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত ; বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৩, ১৮, ৭৮ ; রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী ; লালমোহন বিদ্যানিধি: বিদ্যাসাগর, 'সাহিত্য-সংহিতা', কার্তিক-পৌষ, ১৩২৬ ; শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : চরিতমালা, বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ; শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ; হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩২ ॥

—